স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

উপ-প্রকল্পে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নারী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

আগস্ট ২০২০

এলজিইডি সদর দপ্তর, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬)
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

উপ-প্রকল্পে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে
পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নারী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা		১
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) কার্যক্রম		৩
সেশন ১ঃ	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	৫
সেশন ২ঃ	উপ-প্রকল্পের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম	৭
সেশন ৩ঃ	টেকসই কৃষি উৎপাদন ও নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার	৯
সেশন ৪ঃ	মানসম্মত বীজ ও চারা উৎপাদন	১১
সেশন ৫ঃ	শাকসব্জি পরিকল্পনা	১৫
সেশন ৬ঃ	শাকসব্জি উৎপাদন পদ্ধতি	২১
সেশন ৭ঃ	প্রানিসম্পদ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব	৪৭
সেশন ৮ঃ	হাসঁ-মুরগী ও গবাদিপশু উৎপাদন প্রযুক্তি দেশী মুরগি পালন, লেয়ার পালন, ব্রয়লার পালন, ধানের জমিতে হাঁস পালন, গরু মোটতাজাকরণ, দেশী গরু পালন, বাছুর পালন, ডেইরি উৎপাদন, ছাগল পালন	৪৯
সেশন ৯ঃ	হাসঁ-মুরগী ও গবাদিপশু খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপনন	১৩৫
সেশন ১০ঃ	হাসঁ-মুরগী ও গবাদিপশু রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা এবং কৃত্রিম প্রজনন	১৫৩
সেশন ১১ঃ	রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্য সম্মত ও প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের সেবাঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবা কেন্দ্র	১৬৩
সার আলোচনা ও প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তি		১৬৬

ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় নির্মিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যভূক্তিতে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যাতে করে সকল কার্যক্রমে নারী সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারী থাকে। উপ-প্রকল্প নির্মাণে মাটির কাজে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) নিয়োজিত হয়। এলসিএস এর সদস্যভুক্ত হয়ে নারীরা উপ-প্রকল্প নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করে। উপ-প্রকল্পে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহন এবং কর্মসংসংস্থানের সুযোগ ও পারিবারিক আয় বর্ধনের লক্ষ্যে নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

উপ-প্রকল্প এলাকায় টেকসই কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নারী সদস্যদের বসতবাড়ী ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন এবং হাঁস-মুরগি ও গাবাদিপশু পালনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবে। মাটির কাজে সম্পন্ন হওয়ার পর আগ্রহী নারী শ্রমিকদের বসত বাড়ী সংলগ্ন জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে শাকসব্জি উৎপাদন, উন্নত জাতের শাকসব্জির বীজ সংগ্রহ, হাঁস-মুরগী ও গাভী পালন, বৃক্ষরোপণ, এবং মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদনে সহায়ক হবে। সব্জি চাষ এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণে অধিকতর পারদর্শী হয়ে উঠবে। উপ-প্রকল্প এলাকাধীন বসবাসকারী নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। নিজস্ব চাহিদার অতিরিক্ত বা বাড়তি বীজ, চারা, সব্জি, ফল, কাঠ, হাঁস, মুরগী, দুধ বাজারজাত করতে পারবে। আয়বৃদ্ধি করে নিজ পরিবারে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) কার্যক্রম

পটভূমি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেল এর অন্যতম উপাদান উপজেলা সেচ কর্মসূচীর ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন করে আসছে। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বা ২,৫০০ একর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ এবং ভূপরিস্থ পানি সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বাঁধ, স্লুইস গেট, রেগুলেটর ও সেচ নালা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ বা সংস্কার এবং খাল পুনঃখনন বা খনন করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত এলাকায় পানি সম্পদ বিস্তারিত সম্ভাব্যতা যাচাই এবং স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা ও নকশা চূড়ান্তকরণের পর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। নির্মিত অবকাঠামোসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় জনগণ কর্তৃক উপ-প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নিকট হস্তান্তর করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি ১৯৯৫-২০০২ সালে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলা ও ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ফরিদপুর সহ সর্বমোট ৩৭ জেলায় ২৮০টি উপ-প্রকল্প নির্মিত হয়। এই সমস্ত উপ-প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, পানি সম্পদ অবকাঠামোর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীণ মানুষের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সুযোগ গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। উক্ত সফলতার আলোকে ২০০২-২০০৯ সালে এডিবি ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশে (৩ পার্বত্য জেলা ব্যতিরেকে) দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হয়। এছাড়া জাপান সরকারের সহায়তায় ২০০৫-২০০৬ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৬ জেলার পানি সম্পদ উন্নয়ন মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়। এই প্ল্যানের ভিত্তিতে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)'র আর্থিক সহযোগিতায় ২০০৮-২০১৬ সালে বাস্তবায়িত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৪২টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হয়। এরই মধ্যে ২০১০-২০১৮ সালে এডিবি ও ইফাদ এর আর্থিক সহায়তায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৬১ জেলায় ২৯০টি নতুন উপ-প্রকল্প নির্মাণ এবং ইতোপূর্বে নির্মিত উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়। এ ছাড়া ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী বিভাগের সকল জেলা এবং চট্রগ্রাম বিভবাগের তিনটি পার্বত্য জেলাসহ মোট ২৭টি জেলায় ৫০টি নতুন প্রকল্প এবং ইতোপূর্বে নির্মিত ২৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। একই বছর একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় জাইকার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

লক্ষ্য

দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অলোকে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রণয়ন করা হয়েছে। জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি। প্রকল্পের আওতায় ২০২৩ সালের মধ্যে ১৪৫টি নতুন প্রকল্প নির্মাণ এবং প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ১৩৬টি উপ-প্রকল্পে অতিরিক্ত উন্নয়ন ও ৯টি উপ-প্রকল্প মডেল হিসেবে ফ্লাগশিপ উন্নয়ন করা হবে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সমূহে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি'র কৃতিত্ব ও সফলতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ও ফ্লাগশিপ উন্নয়ন উপ-প্রকল্প নির্বাচন করে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুবিধা বৃদ্ধি, পাবসস অফিস নির্মাণ যদি নির্মিত না হয়ে থাকে এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও কৃষি ভিত্তিক ব্যবসা (এগ্রোবিজনেস) উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। এ ছাড়া ফ্লাগশিপ উন্নয়ন উপ-প্রকল্পে গুদাম তৈরি এবং গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ যেমন রাস্তা ও মার্কেট উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। এই সমস্ত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ১ লাখ ৬০ হাজার থেকে ১ লাখ ৯০ হাজার হেক্টর আবাদি জমি উপকৃত হবে। নিষ্কাশনের উন্নতি এবং অধিক পানি সংরক্ষণের জন্য ভরাট খাল পুনঃখননে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনে প্রকল্প এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। ফলে এই প্রকল্প পল্লী এলাকায় দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নারীদের অংশগ্রহণ

নির্মিত উপ-প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নারী সদসদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। কৃষি উৎপাদন ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নতুন ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগে নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে টেকসই কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। বসতবাড়ী ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন, সব্জি বাগান ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালনসহ আয় বর্ধন মূলক কার্যক্রম এবং শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত, গুদামজাত ও বীজ ব্যবস্থাপনায় নারীরা অধিকতর দক্ষ হয়ে ওঠে। বৃক্ষ উৎপাদন ও বনায়নে নারীদের ভূমিকা মূখ্য হয়ে ওঠে। পানি ব্যবস্থাপনা, সেচ পরিকল্পনা ও সেচ পানি ব্যবহারে নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, কৃষি পণ্য মান সংক্ষণ ও বাজারজাতকরণে নারীদের অবদান বৃদ্ধিতে নিজ পরিবারে তাদের ভূমিকা অধিকতর গুরুতপূর্ণ হয়ে দাড়াঁয়।

সেশন ১ঃ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০১৭ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এই প্রকল্প কার্যক্রমের মূল উদ্দ্যেশ্য হলো টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের সামগ্রিক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ। বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগের মোট ২৯ জেলায় নতুন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প, ইতোপূর্বে নির্মিত উপ-প্রকল্পে অতিরিক্ত উন্নয়ন ও মডেল হিসেবে ফ্লাগশিপ উন্নয়ন উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে উপ-প্রকল্পে খাল খনন বা পুনঃখনন, বাঁধ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, সেচ নালা নির্মাণ বা সংস্কারে সর্বাধিক ১,০০০ হেক্টর উপকৃত এলাকায় কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। উপ-প্রকল্প এলাকায় কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নে যথাযথ অবদান রেখে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতা প্রদানে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন অত্যান্ত অপরিহার্য্য।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জন্য প্রতিটি উপ-প্রকল্পে পানি ব্যবস্থ্যপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠিত হয়। উপ-প্রকল্পের উপকারভোগী ও অংশীজনসহ স্থানীয় জনগণ সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত এই সমিতির সদস্যভুক্ত হয়। পাবসস উপ-প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বাঁধ, খাল, স্লুইস গেট, রেগুলেটর, পানি সংরক্ষণ কাঠামো, সেচ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। উপ-প্রকল্পে কৃষি উৎপাদনে বন্যা, নিষ্কাশন এবং সেচ পানির অভাব ও সরবরাহে সমস্যা চিহ্নিত করে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের কার্যকারিতা অনুযায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সাথে উপ-প্রকল্পে সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে উপকারভোগী কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। পাবসস কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে কৃষি উপ-কমিটি গঠন করে। এই উপ-কমিটি উপ-প্রকল্প এলাকার কৃষি খানার তালিকা ও ভূমি ব্যবহার ম্যাপ তৈরি করে। এই তালিকায় খানা ভিত্তিক আবাদি জমির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য যেমন জমির ধরণ, বর্তমান ব্যবহার ও কৃষি উৎপাদনে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। ভূমি ব্যবহার ম্যাপে আবাদি জমি, শস্য বিন্যাস, শস্যের ধরণ ও জাত এবং বন্যা, নিষ্কাশনে বিঘ্নতা বা জলাবদ্ধতা, খরা ও সেচ পানির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শস্য এলাকার প্রদর্শন করা হয়।উপ-প্রকল্পে নির্মিত কাঠামো সমূহের সঠিক ব্যবহার ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাবসস কৃষক সদস্যদের টেকসই ও পরিবেশ অনুকূল কৃষি উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাতে করে পরিকল্পিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকেরা নিজ অভিজ্ঞতা ও চাহিদার ভিত্তিতে উপ-প্রকল্পের আবাদি জমির যথাযথ ব্যবহার ও জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত কর্মকান্ডে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নত জাতের সব্জি চাষ, পরিচর্যা, বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং হাঁস-মুরগি ও গাবাদিপশু পালনের উপর এই প্রশিক্ষণ উপ-প্রকল্প থেকে নির্বাচিত নারী প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় টেকসই কৃষি উৎপাদন ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নতুন ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগে পারদর্শীতা অর্জনে সহায়ক হবে। উল্লেখিত লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

১. কৃষি ও প্রাণি সম্পদ উৎপাদন, উপকরণ সংগ্রহ, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও মাননিয়ন্ত্রণ এবং পারিবারিক আয় বর্ধনে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নারী সদস্যদের নতুন ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষিতে নারীদের ক্ষমতায়ন।
২. উন্নত পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারে ফসলের বীজ ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষ চারা উৎপাদন ও সরবরাহ, বসতবাড়ী সংলগ্ন জমিতে মাকসব্জি ও মাশরুম চাষ ও বৃক্ষ উৎপাদন।
৩. উপ-প্রকল্প এলাকার খানা তালিকা অনুসারে ফসলের বীজ ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষ চারা উৎপাদন ও সরবরাহ, বসতবাড়ী সংলগ্ন জমিতে সব্জি চাষে মহিলাদের সহায়তা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম আয়োজন।
৪. উন্নত পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, উন্নত জাত সংগ্রহ, খামার উন্নয়ন, চিকিৎসা এবং গাবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি খাদ্য উৎপাদন ও তৈরি।
৫. উপ-প্রকল্প এলাকার খানা তালিকা অনুসারে সকলকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, উন্নত জাত সংগ্রহ, খামার উন্নয়ন, চিকিৎসা এবং গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি খাদ্য উৎপাদন ও তৈরি সংরক্ষণে মহিলাদের সহায়তা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম আয়োজন।
৬. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগব্যাধি বিষয়ে উপ-প্রকল্প এলাকায় সকলের মধ্যে সচেতনা তৈরি।
৭. টিকাদান কেন্দ্রে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টিকার ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে গবাদিপশুর প্রজননে উদ্যোগ গ্রহণ।
৮. প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।
৯. রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্য সম্মত গোশত, ডিম, দুগ্ধ ও প্রাণিজাত পণ্য বিপনন ও সরবরাহ।

সেশন ২ঃ উপ-প্রকল্পের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম

উপ-প্রকল্পের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য

উপ-প্রকল্পের ধরণ অনুসারে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে খাল খনন বা পুনঃখনন, বাঁধ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, সেচ নালা নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়। উপ-প্রকল্প এলাকার পানি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানে নির্মিত অবকাঠামোর কার্যকারিতা সাপেক্ষে উপ-প্রকল্পের ধরণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় চার ধরণের উপ-প্রকল্পে নির্মিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

অবকাঠামোর বৈশিষ্ট্য

উপ-প্রকল্পের ধরণ	অবকাঠামো	উদ্দেশ্য
(১) বন্যা ব্যবস্থাপনা Flood Management (FM)	বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার বা পুনর্বাসন। রেগুলেটর বা স্লুইস। খাল খনন বা পুনঃখনন। কালভার্ট, ইত্যাদি।	বন্যা প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা। সময়মত ফসল বপন বা রোপণ ও কর্তন। বন্যা থেকে ফসল রক্ষা। মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা। মাছ চাষ। বাঁধের পার্শ্বে বৃক্ষ উৎপাদন।
(২) পানি-নিষ্কাশন Drainage(DR)	খাল খনন বা পুনঃখনন। স্লুইস, ইত্যাদি।	সময়মত বন্যাপনি নিষ্কাশন। জলাবদ্ধতা থেকে ফসল রক্ষা। খালে পানি সংরক্ষণ। সময়মত ফসল বপন বা রোপণ ও কর্তন। মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা। মাছ চাষ। বাঁধের পার্শ্বে বা খাল পাড়ে বৃক্ষ উৎপাদন।
(৩) পানি সংরক্ষণ Water Conservation (WC)	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, রাবার ড্যাম, খাল পুন:খনন, কালভার্ট, ইত্যাদি।	খাল ও নদী পানি সংরক্ষণ। মাটির আর্দ্রতা ও সেচ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি সেচ এলাকা প্রসার। অতিরিক্ত সেচ সুবিধা। মাছ চাষ। খাল পাড়ে বৃক্ষ উৎপাদন।
(৪) কমান্ড এলাকা উন্নয়ন Command Area Development (CAD)	সেচ নালা সংস্কার, ভূপরিস্থ বা ভূগর্ভস্থ সেচনালা, হেডার ট্যাংক, একুইডাক্ট, সাইফুন, ইত্যাদি।	খাল ও নদীর পানি সেচ। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। সময়মত ও চাহিদা অনুযায়ী পানি সেচ। সেচ পানির অপচয় রোধ। সেচ এলাকা বৃদ্ধি। বন সম্পদ উন্নয়ন।

উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের উপ-প্রকল্পের ধরণ, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করতে হবে। উপ-প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ সরবরাহের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি, উপ-প্রকল্প উপযোগী কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম প্রণয়ন, দীর্ঘপোযোগী পরিবেশ অনুকূল চাষাবাদ পদ্ধতি প্রয়োগ, কৃষকদের উদ্বুদ্ধ হতে এবং কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজনে এই পর্যালোচনা সহায়ক হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম

এই সমিতির প্রদান কার্যক্রম হলো উপ-প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের চাহিদা ও ডিজাইন মোতাবেক উপ-প্রকল্পের নির্মাণ সময়মত সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ, সদস্যভুক্তিকরণ লক্ষ্য পূরণ, সদস্যদের শেয়ার ক্রয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সমিতিরি নিজস্ব তহবিল বর্ধন, ম্যানেজার/হিসাবরক্ষকের কার্যক্রম অব্যহত রাখার ব্যবস্থা, সমিতির রেজিষ্টারসমূহ এবং রেকর্ডপত্র যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ঝুলে থাকা কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি সাধন,পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবক্ষণ, উন্নত কৃষি উৎপাদন, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্রতা হ্রাস কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিবীক্ষণ, এলজিইডি, ইউনিয়র পরিষদ এবং সমবায়, কৃষি, মৎস্য, প্রাণি সম্পদ ও মহিলা অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা, দরিদ্র সদস্যদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অর্থ যোগান, ক্ষুদ্রচাষী ও ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পাবসস তহবিল অডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ. উপ-প্রকল্পে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, প্রথম বছর যৌথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সমাপ্তির পর উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের ব্যবহারিক মালিকানা গ্রহণ ও পাবসস।

উপ-কমিটি গঠন

সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা, বাস্তবায়ন, তদারক ও পরিবীক্ষণে প্রয়োজন মত উপ-কমিটি গঠিত হবে যেমন, (১) নির্মাণ পরিবীক্ষণ উপ-কমিটি, (২) পরিচালনা ও রক্ষণাবক্ষণ (ওএন্ডএম) উপ-কমিটি, (৩) কৃষি উপ-কমিটি, (৪) কৃষি ব্যবসা ও বিপনন উপ-কমিটি (৫) মৎস্য ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, (৬) ক্ষুদ্র ঋণ উপ-কমিটি, (৭) পরিবেশ ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, (৮) নারী উন্নয়ন উপ-কমিটি (৯) দারিদ্রতা বিমোচন উপ-কমিটি।

সদস্য ও উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন

উপপ্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সমূহের দক্ষ পরিচালনা ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে সাধারণ সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য এবং উপকারভোগীদের স্বস্ব পেশায় ও দায়িত্ব পালনে পারদর্শীতা অর্জনে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি এবং প্রশিক্ষন লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন, সমবায় ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ পরীবিক্ষণ এবং নির্মিত অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, টেকসই কৃষি উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ও সঠিক উপকরণ প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম আয়োজন, গবাদিপশু পালন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, আয়বর্ধন ও কর্মসংস্থান, ও দারিদ্র্য বিমোচন।

সেশন ৩ঃ টেকসই কৃষি উৎপাদন ও নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার

নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে নারীদের আগ্রহ বেশি থাকে। বসৎ বাড়ী ভিত্তিক শাকসব্জি ও বৃক্ষ উৎপাদনে মহিলারা নতুন জাত ও ভালো বীজ সংগ্রহে বেশি উৎসাহী হয়। নারীরা কৃষি উৎপাদনে নতুন তথ্য ও পরামর্শ গ্রহণেও এগিয়ে আসে। যেমন জৈব সার তৈরি ও ব্যবহার, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম প্রয়োগ ও ধানক্ষেতে হাঁস চাষ। নারীরা ফসলের বীজ প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বৃক্ষ পরিচর্যায় তাদের ভূমিকাও লক্ষণীয়। দক্ষতার সাথে সেচপানি ব্যবহার করে। ফলে সেচপানির অপচয় হয় না। নতুন জাত এবং ভালো বীজ ও চারা সরবরাহ করা হলে এবং উন্নত প্রযুক্তি ও পরিচর্যা সম্পর্কে অবহিত হলে নারীরা পারিবারিক কৃষি উৎপাদন ও আয় বর্ধনে অধিকতর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতে পারে।

শাকসব্জি উৎপাদন

সুস্থ ও সবল দেহের জন্য শাকসব্জি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। দেহের অতিরিক্ত ওজন ও মেদ কমাতে শাকসব্জির অবদান সবাই জানেন। এ ছাড়া অনেক রকমের কঠিন রোগ প্রতিরোধে শাকসব্জির গুরুত্ব অপরিসীম। সাম্প্রতিককালে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়

দেখা গেছে যে বাঁধাকপি থেকে শুরু করে টমেটো ও রসুন সহ প্রায় সব রকমের শাকসব্জিতে একাধিক পুষ্টি গুণ রয়েছে যেগুলো আমাদের দেহকে সবল ও নিরোগ রাখতে সহায়তা করে। ক্যারোটিন সমৃদ্ধ রঙিন শাকসব্জি যেমন মিষ্টি কুমড়া ও গাজর আমাদেরকে ধমনী রোগ এমনকি ক্যান্সার এর মত কঠিন রোগ থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। আঁশ সমৃদ্ধ শাকসব্জি যেমন ব্রোকলি ও মটরশুটি আমাদেরকে হৃদ রোগ ও উচ্চ রক্ত চাপ থেকে রক্ষা করে। প্রতিদিন তরকারী, সালাদ, ভাজী, সস্, রস করে যে ভাবেই হোক না কেন শাকসব্জি খাওয়া প্রয়োজন। টাটকা খেতে পারলে ভালো। শুকিয়ে বা ফ্রিজে রেখেও খাওয়া যেতে পারে।

শাকসব্জির চাহিদা

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য হিসেবে শাকসব্জির চাহিদাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজারে শাকসব্জির মূল্য অনেক সময় সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। আগে শাকসব্জির মূল্য ছিল নগণ্য। পাঁচ কেজি শাকসব্জি বিক্রি করেও এক কেজি চাল কেনা যেতো না। বর্তমানে শাকসব্জির বাজারে পরিস্থিতি উল্টো। বিশেষ করে মৌসুমের শুরুতে এক কেজি সব্জির মূল্য পাচ কেজি চালের দামের সমান হয়ে যায়। অন্যদিকে বাজারে বিক্রিত শাকসব্জি সবসময় নিরাপদ নয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে উৎপাদিত শাকসব্জি চাষে অনেক ক্ষেত্রে অত্যাধিক কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় বলে শোনা যায়। আবার অত্যাধিক সার ব্যবহার করে দ্রুত উৎপাদিত শাকসব্জির স্বাদ আশানুরূপ হয় না। এ সব কারণে নিজ বাড়ি সংলগ্ন জমিতে, আঙিনায়, এমনকি শহরে বাড়ির ছাদে শাকসব্জি উৎপাদন জনপ্রিয় বা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া শাকসব্জি উৎপাদন এখন বেশ লাভজনক। সহজে এবং আকর্ষণীয় দামে বিক্রি হয়ে যায়।

উপ-প্রকল্প এলাকায় শাকসব্জি উৎপাদন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন উপ-প্রকল্প এলাকায় শাকসব্জি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ সরবরাহের উন্নতির ফলে সারা বছর প্রায় সব ধরণের জমিতে শাকসব্জি উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রয়োগ এবং কৃষি উপকরণের দক্ষ ব্যবহার করে শাকসব্জি চাষাবাদ এখন বেশ লাভজনক । শাকসব্জি উৎপাদনে কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

শাকসব্জি উৎপাদনের লক্ষ্য

উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিভুক্ত মহিলা সদস্যদের শাকসব্জি উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হলোঃ

- সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদন করে শাকসব্জি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত উৎপাদিত চারা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন।
- শাকসব্জি উৎপাদন করে পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ এবং অতিরিক্ত উৎপাদিত শাকসব্জি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন।
- পরবর্তী ফসলের জন্য বীজ তৈরী, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং অতিরিক্ত উৎপাদিত বীজ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন।

সেশন ৪ঃ মানসম্মত বীজ ও চারা উৎপাদন

বীজ ও চারা সংগ্রহ

পুষ্টিমান, স্থানীয় উপযোগিতা ও চাহিদা অনুযায়ী জাত নির্বাচন করে নির্ভরযোগ্য বীজ বিক্রেতা বা নার্সারি থেকে মান সম্মত বীজ বা সুস্থ ও সবল চারা সংগ্রহ করে নিতে হবে। মান সম্মত বীজ নির্ভেজাল, পরিষ্কার, সম আকারের পুষ্ট দানা এবং পোকামাকড় ও রোগমুক্ত হবে। কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ বীজ গজানোর বা অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। এতে কম বীজের প্রয়োজন হয়, খরচ কম হয় এবং ফলন বেশি পাওয়া যায়। গাছে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়। বীজ ক্রয়ের সময় ভালভাবে প্যাকেটকৃত, প্যাকেটের লেবেলে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত যেমন- অঙ্কুরোদগম হার, আর্দ্রতা, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ, জাতের নাম, যে জাতের বীজ সেই জাতের শাকসব্জির ছবি ইত্যাদি পরীক্ষা করে নিতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) খামার বা বিক্রয় কেন্দ্র নির্ভরযোগ্য বীজ বা চারার প্রাপ্তিস্থান ।

বীজ গজানোর হার বা অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা

বপনের পূর্বে বীজ অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার পরীক্ষা করে নেয়া ভালো। দুই হাত দৈর্ঘ্য ও দুই হাত প্রস্থ এক টুকরা সুতি কাপড় ভিজিয়ে নিতে হবে। ভেজানো কাপড়টি বিছিয়ে এক আঙ্গুল অন্তর ১০০টি বীজ সাজিয়ে দিতে হবে। কাপড়টির এক পার্শ্বে লাঠি রেখে ধীরে ধীরে গোল করে পেচিয়ে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে পেচ যেন বেশী শক্ত না হয়। পেচানো কাপড়টির উপর পানি ছিটিয়ে ভেজা রাখতে হবে। এটাকে ঘরের এক কোনে রাখতে হবে যেন সূর্যের আলো ও বাতাসের লাগালের বাইরে থাকে। অতিরিক্ত ভেজা হলে বীজ পচে যেতে পারে। এভাবে ৭-১০ দিন রেখে দেয়ার পর পেচ খুলে বীজ গজালো কিনা পরীক্ষা করতে হবে। যদি শতকরা ৮০ ভাগ বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং সুস্থ সবল মনে হয় তাহলে বীজের মান ভালো মনে করতে হবে।

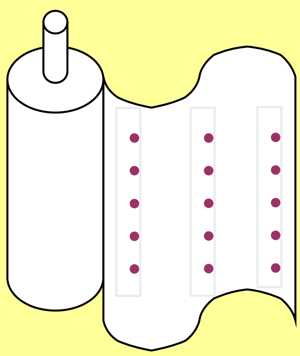

সারি করে বীজ সাজানো

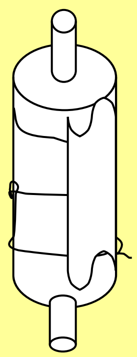

পেচিয়ে নেয়ার পর

বীজ থেকে গজানো চারা স্থানান্তর বা বিক্রির জন্য গোড়ায় মাটিসহ সঠিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে বা টবে সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষণের পূর্বে মোট অংশের ১ ভাগ দোআঁশ মাটি, ১ ভাগ ভিটি বালি, ২ ভাগ কম্পোষ্ট, ২ ভাগ পচা গোবর সার, ১ ভাগ ছাই ও সামান্য কয়লার গুঁড়া, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০ গ্রাম টিএসপি ও ১০ গ্রাম এমপির মিশ্রণে পলিথিন ব্যাগ বা টব পূর্ণ করতে হবে।

শাকসব্জির বীজ বপন ও চারা রোপণ

নির্দিষ্ট মৌসুমের শুরুতেই শাকসব্জি আবাদের কাজ শুরু করতে হবে। শাকসব্জির জাত ও গাছের আকারের উপর বীজ বপন ও চারা, লতা বা কাটিং রোপণের স্থান, পদ্ধতি ও দূরত্ব নির্ভর করবে। আকার ছোট হলে মাদা করে, বড় হলে সারি দিয়ে ও লতানো হলে মাচা করে বপন বা রোপণ করা ভাল।

বীজ শক্ত হলে বপনের আগে ভিজিয়ে নেয়া ভালো। যেমন শিমের ও পুঁই শাকের বীজ ১০-১২ ঘন্টা এবং ঢেঁড়শ ও ধনিয়া বীজ ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে নিলে বপনের পরে কম সময়ে অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। তাড়াতাড়ি অঙ্কুরোদগমের ফলে পাখি বীজ খাওয়ার সুযোগ পাবে না। রোগব্যাধি ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ কমে যাবে। পানি সেচের প্রয়োজন হবে না বা কম লাগবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে দীর্ঘ সময় ভিজিয়ে রাখলে বীজের ক্ষতি হতে পারে। ভিজানোর পর খারাপ বীজ ভেসে উঠলে তুলে ফেলে দিতে হবে। জমিতে স্বল্প গভীর নালা তৈরী করে বীজ বপন করা ভালো। এতে পানি সেচ কম লাগবে।

বপনের পূর্বে জমিতে জৈব সার ব্যবহার করলে মাটি ভেদ করে চারা সহজে বের হয় ও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মাটিতে পানি প্রবেশ এবং রস ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বোনার সময় বীজ মাটির সাথে মিশিয়ে নেয়া ভালো। যেমন ডাটার বীজ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে একটার সাথে অন্যটা লেগে থাকেনা, ফলে বোনা সহজ হয়। নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা রোপণ বা বীজ বপন করা ভালো। অতিরিক্ত ঘন বপন বা রোপণে ফলন কমে যায়। কারণ গাছ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য নিতে পারে না এবং প্রয়োজনীয় পানি ও আলো পেতে সমস্যা হয়।

বিকেল বেলা বীজ বোনা ভালো। বীজ পাতলা করে বপন করতে হবে। ঘন করে বপন করলে চারা দুর্বল হবে। বপনের পর বেলে মাটি ও জৈব সার মিশিয়ে বীজ ঢেকে দেয়া ভালো। যেন বীজ শুকিয়ে না যায়। বীজ ঢেকে ফেলার পর একটু চেপে দিতে হবে। এতে করে মাটিতে রস ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বাতাসে সহজে বীজ সরে যাবে না। পোকামাকড় ও পাখি ও বীজের ক্ষতি করতে পারবে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে ঢেকে দেয়া মাটির স্তর যেন বেশী পুরু না হয়। এতে অঙ্কুরোদগমের পরে চারা বের হয়ে আসতে সমস্যা হবে। এঁটেল মাটিতে বপনের ক্ষেত্রে উপরি স্তর পাতলা হবে। সাধারণত বীজের পরিধির তুলনায় মাটির উপরি স্তর র ২-৩ গুণ বেশী পুরু। তবে বেলে মাটি হলে ৫-৬ গুণ বেশী পুরু হবে।

বীজতলায় শাকসব্জির চারা উৎপাদনঃ বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি সব্জি চাষে বীজতলা তৈরী করে আলাদা চারা উৎপাদন করে নেয়া ভালো। প্রচুর আলোবাতাস পায় এমন উঁচু জমিতে বীজতলা তৈরী করতে হবে। বীজতলার মাটি যথেষ্ট উর্বর হওয়া প্রয়োজন। জমির মাটির সাথে জৈবসার যেমন পচা গোবর বা আবর্জনা মিশিয়ে নিতে হবে। সুস্থ ও সবল চারার জন্য বীজতলার যত্ন নিতে হবে। বীজতলার চারিদিকে ছাইয়ের সাথে সামান্য কেরোসিন তৈল মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে পিঁপড়ার আক্রমণ হবে না। চারা উঠানোর পূর্বে বীজতলায় সামান্য পানি ছিটিয়ে নিতে হবে । এতে চারা তুলতে সহজ হবে।

অল্প চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলার পরিবর্তে মাটির টবে অথবা ভাঙ্গা কলস বা হাঁড়ি, প্লাস্টিকের বালতি বা বোতল, কাঠের বাক্স, ও কার্টুন বাক্স নিচে ফুটো করে জৈবসার মেশানো মাটি ভরে বীজ বপন করা যায়।

পরবর্তী ফসলের জন্য বীজ সংগ্রহ

প্রথম বার চাষাবাদের পর পরবর্তী ফসলের জন্য আবাদকৃত শাকসব্জির গাছ থেকে বীজ বা কাটিং সংগ্রহ করে রাখা অপরিহার্য। এতে করে উৎপাদন খরচ কম হয় এবং পরবর্তী চাষাবাদে বীজের জন্যে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় না। তবে নিচে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

- উৎপাদিত শাকসব্জির গাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে ।
- শাকসব্জি আবাদের সমস্যার পরিধি যেমন রোগ ব্যাধির প্রকোপ, পোকামাকড় আক্রমণ কম হবে।
- উৎপাদিত শাকসব্জির ফলন আশানুরূপ হবে।
- ফসলের গুণাগুণ, আকার আকৃতি, স্বাদ ও বাজারে চাহিদা সন্তষজনক হবে।
- হাইব্রীড বীজ থেকে উৎপাদিত শাকসব্জির বীজ সংগ্রহ না করা।

বীজ সংগ্রহের ব্যাপারে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কৃষি সাব-কমিটির সাথে পরামর্শ করে নেয়া ভালো।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতিঃ নিচে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে

- সুস্থ ও সবল গাছ নির্বাচন,
- রোগব্যাধি ও পোকামাকড় আক্রমণ মুক্ত
- পরিপুষ্ট বীজ
- ফল শুকিয়ে যাওয়ার পূর্ব মূহুর্তে বাদামি রং ধারণ করলে
- সংগ্রহের পর কাপড়, কাগজ বা মাদুরের উপর ফল বা শুঁটিসহ বীজ শুকাতে হবে
- ফল বা শুঁটি ফেটে গেলে বীজ সংগ্রহ করতে হবে
- হালকা ঘষে বীজ পরিষ্কার করে ছায়াতে বা সামান্য রৌদ্রে শুকাতে হবে
- ভালো বীজ বাছাই করতে হবে এবং আবর্জনা মুক্ত করতে হবে।

বীজ সংগ্রহে সতর্কতা

প্রথমবারে আবাদকৃত শাকসব্জির বীজ যদি মৌল বীজ বা ব্রিডারস সীড, ভিত্তি বীজ বা ফাউন্ডেশন সীড, প্রত্যায়িত বীজ বা সার্টিফাইড বীজ, এবং মানঘোষিত বীজ বা ট্রুথফুলি লেবেলড সীড থেকে ক্রয় করা বা সংগৃহিত হয় তাহলে পরবর্তী ফসলের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে। আর যদি হাইব্রীড বীজ হয় তাহলে পরবর্তী মৌসুমে ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এই বীজ থেকে উৎপাদিত অধিকাংশ চারা দুর্বল ও অপুষ্ট হবে। ফলে রোগব্যাধি ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশী হবে। আকৃতি ছোট হবে এবং ফলন অনেক কম হবে।

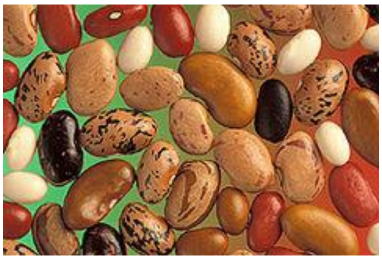

বীজ সংরক্ষণঃ বীজ কম আর্দ্রতা ও তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। মাটির পাত্রে বীজ ঢুকিয়ে মুখ এটেল মাটি দিয়ে বন্ধ করে বীজ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এক টুকরো কাপড় গলানো মোমে ডুবিয়ে মুখ বন্ধের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। মাটির পাত্রের পরিবর্তে সিরামিক বা চিনামাটির তৈরী পাত্রেও বীজ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কাঠের, টিনের, কাচের বা লোহার পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে মুখ যেন ভালোভাবে বন্ধ থাকে যাতে করে বাইরের বাতাস ঢুকতে না পারে এবং পোকামাকড় ও রোগব্যাধি আক্রমণ না করতে পারে।

সেশন ৫ঃ শাকসব্জি উৎপাদন পরিকল্পনা

বাজার চাহিদাঃ শাকসব্জির জাত নির্বাচনে বাজারজাত করণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এব্যপারে স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, বসবাসকারী লোকদের পছন্দ ও ক্রয় ক্ষমতা, বাজারে চাহিদা, বহনের ব্যবস্থা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

নিজ পরিবারের পুষ্টি চাহিদা, শাকসব্জির পুষ্টিমান, বপন বা রোপণের কতদিন পরে শাকসব্জি খাওয়ার উপযুক্ত হবে, শাকসব্জি আবাদি জমির পরিমাণ, কতগুলো প্লট আছে ইত্যাদি বিবেচনা করে সারা বছর শাকসব্জি খাওয়ার জন্য একটি উৎপাদন পরিকল্পনা করতে হবে। নিচে একটি নমুনা দেয়া হলে।

শাকসব্জি উৎপাদন পরিকল্পনা

প্লট নং	শ্রাবন - অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ - চৈত্র	চৈত্র - শ্রাবন
১	পালং শাক	মুলা	ঢেঁড়শ
২	লাউ	বেগুন	বরবটি
৩	কাঁচা মরিচ	টমেটো	বাটি শাক
৪	লাল শাক	শিম	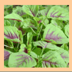 ডাঁটা
৫	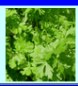 ধনিয়া	মটরশুঁটি	পুঁই শাক
৬	ফুল কপি	বাঁধা কপি	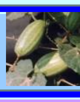 পটল
৭	ব্রোকলি	শালগম	করলা বা উচ্ছে
৮	গাজর	মিষ্টি আলু	ধুন্দল
৯	আলু	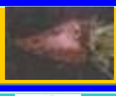 বীট	শসা
১০	ওলকপি	মিষ্টিকুমড়া	চিচিংগা

একই সাথে ডাটা, রসুন ও ধনিয়ার চাষ

ভুট্টা গাছের ফাঁকে পেঁয়াজের চাষ

জমির আইলে শিমের চাষ

উঠানের পাশে সব্জির চাষ

খাল পাড়ে সব্জির চাষ

পুকুর পাড়ে সব্জির চাষ

পরিশিষ্ট-১ এ বিভিন্ন শাকসব্জি চাষাবাদের জন্য, উপযোগী মাটির ধরণ, জাত, বপন ও রোপণের সময় বীজের চাহিদা, বপন ও রোপণের দুরত্ব, সারের চাহিদা ও ফসল সংগ্রহের সময় বর্ণনা করা হলো।

শাকসব্জির জাত নির্বাচন

ভূমি ও মাটির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে কোন মৌসুমে কি জাতের শাকসব্জি চাষ করা যাবে তা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে নির্ধারণ করতে হবে। শাকসব্জির জাত নির্বাচনে আগাম, মাঝ মৌসুমি, নাবি, রোগ ও পোকামাকড় আক্রমণ প্রতিরোধক ক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে। এ ব্যপারে নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

বছরব্যাপী আবাদঃ বাগান থেকে যেন সারা বছর শাকসব্জি পাওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ছাড়া শাকসব্জির বাগান যেন দেখতে সুন্দর হয়, পরিবারের সকলে মিলে চাষাবাদ করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। নিচে বছরের কোন মাসে কি কি শাকসব্জি বপন বা রোপণ করা যায় তার একটি তালিকা দেয়া হলো।

শাকসব্জি বপন ও রোপণ সময়

মাস	শাকসব্জির নাম
বৈশাখ	পুঁই শাক, লাল শাক, বাটি শাক, ডাঁটা, বেগুন, ঢেঁড়শ, করলা, উচ্ছে, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, শসা, চিচিংগা, ঝিংগা, বরবটি, ধুন্দল, পটল, আদা, কাঁচা মরিচ
জ্যৈষ্ঠ্য	পুঁই শাক, লাল শাক, বাটি শাক, ডাঁটা, ঢেঁড়শ, করলা, উচ্ছে, চালকুমড়া, শসা, চিচিংগা, ঝিংগা, বরবটি, ধুন্দল, আদা
আষাঢ়	লাল শাক, বাটি শাক, শিম, বরবটি
শ্রাবণ	বটি শাক, লাউ, শিম
ভাদ্র	পালং শাক, লেটুস, লাল শাক, বাটি শাক, বেগুন, লাউ, শিম, মটরশুঁটি, বাঁধা কপি, ফুল কপি, ব্রোকলি, শালগম, ধনিয়া, কাঁচা মরিচ
আশ্বিন	পালং শাক, লেটুস, লাল শাক, বাটি শাক, বেগুন, লাউ, মটরশুঁটি, মুলা, গাজর, বাঁধা কপি, ফুল কপি, ব্রোকলি, ওলকপি, ধনিয়া, বীট, শালগম, রসুন, পেয়াঁজ, কাঁচা মরিচ
কার্তিক	পালং শাক, লেটুস, লাল শাক, বাটি শাক, টমেটো, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, মটরশুঁটি, আলু, মিষ্টি আলু, মুলা, গাজর, বাঁধা কপি, ফুল কপি, ব্রোকলি, ওলকপি, ধনিয়া, বীট, শালগম, রসুন, পেয়াঁজ
অগ্রহায়ণ	পালং শাক, লেটুস, লাল শাক, বাটি শাক, টমেটো, মটরশুঁটি, আলু,গাজর, ব্রোকলি, ওলকপি, বীট, পটল
পৌষ	পালং শাক, লেটুস, লাল শাক, বাটি শাক, টমেটো, করলা, উচ্ছে, মটরশুঁটি, পটল
মাঘ	লাল শাক, বাটি শাক, টমেটো, বেগুন, করলা, উচ্ছে, শসা, ঝিংগা, পটল
ফাল্গুন	পুঁই শাক, লাল শাক, বটি শাক, ডাঁটা, বেগুন, ঢেঁড়শ, করলা, উচ্ছে, মিষ্টিকুমড়া, শসা, চিচিংগা, ঝিংগা, ধুন্দল, পটল
চৈত্র	পুঁই শাক, লাল শাক, বাটি শাক, ডাঁটা, করলা, উচ্ছে, চালকুমড়া, শসা, চিচিংগা, ঝিংগা, বরবটি, ধুন্দল, পটল, আদা, কাঁচা মরিচ

পুষ্টি চাহিদাঃ এক এক শাকসব্জির পুষ্টিমান ভিন্ন। সুতরাং শাকসব্জির জাত নির্বাচনে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবেঃ

- ⇨ নিজ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও তাদের বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণ
- ⇨ পুষ্টির কার্যকারিতা এবং কোন ধরনের শাকসব্জি থেকে সেগুলো পাওয়া যাবে
- ⇨ শাকসব্জির পুষ্টিমান

দৈনিক পুষ্টি চাহিদা

সদস্য	বয়স (বৎসর)	ওজন (কিলোগ্রাম)	পুষ্টি চাহিদা				
			খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	আমিষ (গ্রাম)	ক্যারোটিন (মাইক্রো গ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)	লৌহ মিলিগ্রাম)
শিশু	১ এর নিচে	৭.৩	৮২০	১৪	১৮০০	৩০	৫-১০
	১-৩	১৩.৪	১৩৬০	১৬	১৫০০	৩০-৬০	৫-১০
	৪-৬	২০.২	১৮৩০	২০	১৮০০	৩০-৬০	৫-১০
	৭-৯	২৮.১	২১৯০	২৫	২৪০০	৩০-৬০	৫-১০
মহিলা	১০-১২	৩৮.০	২৩৫০	২৯	৩৪৫০	৫০	৫-১০
	১৩-১৫	৪৯.৯	২৪৯০	৩১	৪৩৫০	৫০	১২-২৪
	১৬-১৯	৫৪.৪	২৩১০	৩০	৪৫০০	৬০	১৪-২৮
	প্রাপ্ত বয়স্ক	৫৫.০	২২০০	২৯	৪৫০০	৬০	১৪-২৮
	গর্ভবতী		২৫৫০	৩৮	৪৫০০	৭০	২৮
	শিশু বুকের দুধ খায়		২৭৫০	৪৬	৭২০০	৯০-৯৫	২৮
পুরুষ	১০-১২	৩৬.৯	২৬০০	৩০	৩৪৫০	৩০-৬০	৫-১০
	১৩-১৫	৫১.৩	২৯০০	৩৭	৪৩৫০	৩০-৬০	৯-১৮
	১৬-১৯	৬২.৯	৩০৭০	৩৮	৪৫০০	৬০	৫-৯
	প্রাপ্ত বয়স্ক	৬৫.০	৩০০০	৩৭	৪৫০০	৬০	৫-৯

পুষ্টি	কার্যকারিতা	উৎস
খাদ্যশক্তি	কাজের জন্য শক্তি, কর্মক্ষমতা বজায় রাখা ও দুর্বলতা দূর করে	সবরকমের শাকসব্জি
আমিষ	দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ	গাঢ় সবুজ রঙের পাতা সমৃদ্ধ সব্জি
ভিটামিন এ	দৃষ্টিশক্তি, হাঁড় বৃদ্ধি, সুস্থ চামড়া, ছোঁয়াছে রোগ প্রতিরোধ	ক্যারোটিন সমৃদ্ধ রঙিন শাকসব্জি
ভিটামিন সি	হাঁড়, দাঁত ও চামড়া বৃদ্ধি	গাঢ় সবুজ রঙের পাতা সমৃদ্ধ সব্জি
ফোলাসিন	সাদা রক্ত কণিকা উৎপাদন	গভীর সবুজ রঙের পাতা সমৃদ্ধ সব্জি
ভিটামিন বি-১	স্নায়ূতন্ত্র কার্যকর রাখে	প্রায় সবরকমের শাকসব্জি
ভিটামিন বি-২	খাদ্যশক্তি ও আমিষ ব্যবহারে সহায়তা, টিসু বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ	গাঢ় সবুজ রঙের পাতা সমৃদ্ধ সব্জি
থায়াসিন	খাদ্য বিপাক বা মেটাবলিজম	শাকসব্জির বীচি
লৌহ	রক্ত তৈরী	প্রায় সবরকমের শাকসব্জি ও বীচি
দস্তা	টিসু বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ	গাঢ় সবুজ রঙের পাতা সমৃদ্ধ সব্জি
ক্যালসিয়াম	হাঁড় ও দাঁত বৃদ্ধি, বিশেষ করে বাচ্চাদের	গাঢ় সবুজ রঙের পাতা সমৃদ্ধ সব্জি

শাকসজির পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

শাকসজির নাম	আমিষ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	খনিজ লবন (গ্রাম)	ভিটামিন বি-১ (মিলি গ্রাম)	ভিটামিন বি-২ (মিলি গ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলি গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলি গ্রাম)	লৌহ (মিলি গ্রাম)	ক্যারেটিন (মাইক্রো গ্রাম)	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)
পালং শাক	৩.৩	৪.০	০.১	১.৮	০.০৩	০.০১	৯৭	৯৮	১০.৯	৮৪৮৭	৩০
পুঁই শাক	২.২	৪.২	০.২	১.৪	০.০২	০.৩৬	৬৪	১৬৪	১০	১২৭৫০	২৭
পুঁই ডাটা	২.০	২.৯	০.২	০.৬	০.০৪	০.১০	১১	৭৬	০	২৬৩০	২১
লেটুস	২.১	২.৫	০.৩	১.২	০.০৯	০.১০	১০	৫০	২.৪	৯৯০	৪১
লাল শাক	৫.৩	৫.০	০.১	১.৬	০.১	০.১৩	৪৩	৩৭৪	০	১১৯৪০	৪৩
বাটি শাক	১.৫	৪.০	০.২	০	০.০৫	০.০৫	৪০	৪০	০.৫	৩০০	৩০
ডাঁটা শাক	১.৮	৩.৩	০.২	০.৫	০.২৬	০.১৬	৮০	৮০	২৫.৫	১০১০০	২২
ডাঁটা	০.৯	৩.৫	০.১	১.৮	০.০১	০.১৮	১০	২৬০	১.৮	২৫৫	১৯
সরিষা শাক	৪	৩.২	০.৬	১.৬	০.০৩	০	৩.৩	১৫৫	১৬.৩	২৬২২	৩.৪
কলমি শাক	১.৮	১.৪	০.১	১.১	০.১৪	০.৪	৪২	১০৭	৩.৯	১০৭৪০	৪৬
থানকুনি	২.৬	১৫.৩	০.১	২.৭	০.০৯	১.০	২১	১০৫	০	১৩১০০	৭৩
পাট শাক	২.৬	১২.৭	০.১	১.৩	০.১	০.০৯	সামান্য	১১৩	০	১১৭০০	৬২
হেলেঞ্চা শাক	১.১	৮.১	০.১	০.৮	০.০১	০.১৬	সামান্য	৩১	০	১৩৭০০	৪১
টমেটোঃকাঁচা	১.১	৩.৩	০.১	০.৬	০.০৭	০.০১	৩১	২০	১.৮	১৯২	২৩
টমেটোঃ পাকা	০.১	৩.৬	০.২	০.৫	০.১২	.০৬	২৭	৪৮	০.৪	৩৫১	২০
বেগুন	১.৮	২.২	২.৯	০.৮	০.১২	০.০৮	৫	২৮	০.৯	৮৫০	৪২
ঢেঁড়শ	১.৮	৮.৭	০.১	১.১	০.০৪	০.১৬	১০	১১৬	১.৫	১৬৭০	৪৩
করলা	২.৫	৪.৩	০.১	০.৯	০.০৪	০.০২	৬৮	১৪	১.৮	১৪৫	২৮
উচ্ছে	২.১	১০.৬	১.০	১.৪	০.০৭	০.০৬	৯৬	২৩	২.০	১২৬	৬০
কাঁকরোল	২.১	১৭.৪	০.৩	০.৯	০.০৮	০.০৬	০	৩৬	০	৪১০	৮০
চালকুমড়া	০.৪	১.৯	০.১	০.৩	০.০৬	০.০১	১.০	৩০	০.৮	০	১০
মিষ্টিকুমড়া	১.৪	৪.৫	০.৫	০.৭	০.০৭	০.০৬	২৬	৪৮	০.৭	৭২০০	৪১
মিষ্টিকুমড়া পাতা	২.১	২.০	০.২	১.৪	০.১২	০.২৪	৬১	৪০	০	১২০০০	৩৮
লাউ	১.১	১৫.১	০.১	০.৬	০.০১	০.০২	৪	২৬	০.৭	০	৬৬
লাউ পাতা	২.৩	৬.১	০.৭	১.৭	০	০	১০	৮০	০	০	৩৯
শসা	১.৬	৩.৫	০.১	০.৪	০.১৬	০.০২	৫	১৫	১.৫	সামান্য	২২
চিচিংগা	০.৫	৩.৩	০.৩	০.৫	০.০৪	০.০৬	০	২৬	০.৩	৯৬	১৮
ঝিংগা	১.৮	৪.৩	০.৬	০.৩	০.১১	০.০৩	৩	১৬	০.৫	৬৭০	৩০
শিম	৩.৯	৬.৭	০.৭	০.৯	০.০১	০.০৫	৯	২১০	১.৭	১৮৭	৪৮
বরবটি	৩.০	৯.০	০.২	০.৮	০.১৪	০.০৩	সামান্য	৩৩	৫.৯	০	৫০
মটরশুটি	৭.৪	২৩.৭	০.৩	১.২	০.০১	০.১২	৫	২৬	১.৫	৮৩	১২৭
ধুন্দল	০.৯	৫.৯	০.২	০.৭	০.০৩	০.০১	৫	১১	০.৬	০	২৩
আলু	৩.০	১৯.১	০.১	১.৯	০.০৩	০.০৩	১০	১১	০.৭	০	৮৯

শাকসজির নাম	আমিষ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	খনিজ লবন (গ্রাম)	ভিটামিন বি-১ (মিলি গ্রাম)	ভিটামিন বি-২ (মিলি গ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলি গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলি গ্রাম)	লৌহ (মিলি গ্রাম)	ক্যারেটিন (মাইক্রো গ্রাম)	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)
মিষ্টি আলু শাক	৪.২	৯.৭	০.৮	২.২	০.০৭	০.২৪	২৭	৩৬০	১০.০	৭৮০০	৬৩
মিষ্টি আলু	০.৭	২১.৬	০.৪	১.০	০.০৬	০.০২	২	১৭	০.৮	০	৯৩
মেটে আলু	১.৫	২২	০.৮	২.২	০.১৬	০.২৩	২৭	২৫৮	১০	০	৯৫
মুখি কচু	১.৮	৩২.৪	সামান্য	১.৫	০.০৪	সামান্য	সামান্য	২২	০	০	২৬৬
ওল	১.২	১৮.৪	০.১	০.৮	০.০৬	০.০৭	০	৫০	০.৬	২৬০	৭৯
মুলা শাক	১.৭	২.৫	০.৯	০.৫৭	০.০৪	০.০৯	১৪৮	২৮	৩.৬	৯৭০০	২৪
মুলা	১.৩	৫.৪	০.১	০.৫০	০.৪৩	সামান্য	৩৪	২৫	০.৫	০	২৮
গাজর	১.২	১২.৭	০.২	০.৯	০.০৪	০.০৫	১৫	২৭	২.২	১০৫২০	৫৭
বাঁধা কপি	১.৩	৪.৭	০.২	০.৫	০.০৬	০.০৫	৬০	৩১	০.৮	৬০০	২৬
ফুল কপি	২.৬	৭.৫	০.১	০.৮	০.০২	০.০৩	৯১	৪১	১.৫	০	৪১
চায়না কপি	১.৫	৪.০	০.২	০	০.০৫	০.০৫	৪০	৪০	০.৫	৩০০	৩০
ব্রোকলি	৩.৩	৫.৫	০.১	০	০.১৬	০.১১	১১৮	১৫০	১.৬	০	৩২
ওলকপি	১.০	৬.১	০.১	১.৩	০.০১	০.০৩	৫৩	২৫	০.৪	০	৪১
পুদিনা পাতা	২.৯	৯.১	০.১	১.৬	০.০৯	০.০৮	২৮	৮৫	১৫.৬	১৩৩০০	৪৯
ধনে পাতা	৩.৩	৪.১	০.৭	১.৬	০.০৫	০.১৮	৪	২৯০	২০.১	৩০৭২	৩৮
শাপলাঃ লাল	৪.১	৪৩.৪	০.৩	১.৬	০	০	০	৬৫	০	০	১৯৩
শাপলাঃ সাদা	৩.১	৩১.৭	০.৩	১.৩	০	০	০	৭৬	০	০	১৪২
সজিনা	৩.২	১১.৪	০.১	১.৯	০.০৪	০.০২	৪৫	২১	৫.৩	৭৫০	৬০
সজিনাঃ শাক	৬.৭	১২.৫	১.৭	২.৩	০.০৬	০.০৫	২২০	৪৪০	৭.০	৬৭৮০	৯২
বীট	২.০	১১	০.১	১.৪	০.০৩	০.০৬	১৫	২৪	০.৪	০	৫৩
বীট পাতা	৩.৪	৬.৫	০.৮	২.২	০.২৬	০.৫৬	৭০	৩৮০	১৬.২	৫৮৫২	৪৬
শালগম	১.৪	৬.২	সামান্য	০.৬	০.০৩	০.০২	১৫	২৪	০.৪	০	২১
শালগম পাতা	৪	৯.৪	১.৫	২.২	০.৩১	০.৫৭	১৮০	৭১০	২৮.৪	৯৩৯৬	৬৭
পটল	২.৪	৪.১	০.৬	০.৫	০.৩০	০.০৩	২	২০	১.৭	৭৯০	৩১
পটল পাতা	৫.৪	৫.৮	১.১	৩	০	০	০	৫৩১	০	০	৫৫
আদা	২.৩	১২.৩	০.৯	১.২	০.০৬	০.০৩	৬	২০	২.৬	৪০	৬৭
রসুন	৬.৩	২৯.৮	০.১	১	০.০৬	০.২৩	১৩	৩০	১.৩	০	১৪৫
পেয়াঁজ	১.৮	১২.৬	০.১	০.৬	০.০৮	০.০২	২	৪০	১.২	১৬	৫৯
পেয়াঁজ কলি	০.৯	৮.৯	০.২	০.৮	০	০.০৩	১৭	৫০	৭.৫	৫৯৫	৪১
ধনিয়া	১৪.১	২১.৬	১৬	৪.৪	০.২২	০.৩৫	০	৬৩০	১৭.৯	১৪২	২৮৮
ধনিয়া পাতা	৩.৩	৪.১	০.৭	১.৬	০.০৫	০.১৮	৪	২৯০	২০.১	৬০৭২	৩৮
কাঁচা মরিচ	১.৬	২৩.৭	০.১	১.০	০.১৭	০.১৮	১২৫	১১	১.২	২৩৪০	১০৩

সেশন ৬ঃ শাকসব্জি উৎপাদন পদ্ধতি

শাকসব্জি চাষাবাদে ভূমির সঠিক ব্যবহার ও উর্বরতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এ জন্য নিচে বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য।

- উপযুক্ত জমি নির্বাচন করে চাষাবাদ করা। পানি জমে থাকেনা, সহজে নিষ্কাশিত হয়, দিনের বেলা সূর্যের আলো পায় ও পানি সেচের সুবিধা আছে এমন জমি নির্বাচন করা।
- জমির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতের শাকসব্জি চাষাবাদ।
- বেশী করে জৈব সার ব্যবহার। যেমন কম্পোষ্ট, সবুজ সার ও গোবর সার। স্থানীয় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী অনুমোদিত হারে রাসায়নিক সার ব্যবহার।
- সেচ দিয়ে আবাদে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী জাত নির্বাচন। পানির অপচয় রোধে সঠিক পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ।
- শাকসব্জির অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গ ও রোগব্যাধি দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) প্রয়োগ। স্থানীয় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ ব্যতীত জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ না করা। কীটনাশক ব্যবহার একান্ত জরুরী হলে পোকা শনাক্তকরণ সাপেক্ষে কীটনাশকের ধরণ ও মাত্রা জেনে নিতে হবে ।

জমি তৈরী

সময়ঃ নিজ এলাকায় বৃষ্টিপাতের হার, তাপমাত্রা, সেচের জন্য পানির প্রাপ্যতা, পোকামাকড় ও রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা, মাচা ও বেড়া দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্যতা ইত্যাদি যাচাই করে জমি তৈরীর সময় নির্ধারণ করতে হবে।

মাটিঃ সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত খোলামেলা জমি নির্বাচন করে মাটির ধরণ দেখে নিতে হবে। বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি সবচেয়ে উপযুক্ত। সম্পূর্ণ বেলে বা এঁটেল মাটি হলে জৈব সার প্রয়োগ করে উপযোগী করে নিতে হবে

শাকসব্জির বাগানের নকশা

চাষঃ জমি আগাছামুক্ত করে কমপক্ষে আধা হাত

গভীরতায় চাষ দিয়ে বা কুপিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। চাষের শেষ পর্যায়ে অনুমিদিত হারে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হবে। চাষ শেষে জমি সমতল করে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কয়েকটি প্লটে ভাগ করে নেয়া ভালো। প্রতিটি প্লটের চারিদিকে পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা রাখতে হবে। যেন বৃষ্টির পানি বা অতিরিক্ত সেচের পানি না জমে ও সহজে জমি থেকে সরে যায়। এক এক প্লটে বিভিন্ন জাতের শাকসব্জির আবাদ করা ভালো। চলাচল, পানি সেচ ও পরিচর্যার সুবিধার্থে বাগানের একটা নক্সা করে নিতে হবে।

মূল জমিমূল জমির উপর উপর মাটি উঁচু করে চারিদিকে কাঠের ফ্রেম দিয়ে প- ট তৈরী করা যায়। দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের জন্য কাঠের বদলে কংক্রিটের ফ্রেম ব্যবহার করা ভাল। । প্রতিটি প্লট ৫০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার চওড়া এবং ২০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু করা যেতে পারে। প্লট করে শাকসব্জি চাষের সুবিধা হলো মৌসুমের শুরুতে আগাম বীজ বপন বা চারা রোপণ করে আগেভাগে ফসল সংগ্রহ করা যায়। কারণ মূল জমি বর্ষার পানিতে ভিজা থাকায় দেরীতে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হয়। এ ছাড়া উঁচু প্লটের মাটি উষ্ণ থাকায় ফলনও বেশী হয়।

সরঞ্জামঃ জমি তৈরী ও শাকসব্জি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে। যেমন কোদাল, নিড়ানি, কাঁচি, ধারালো ছুরি, ব্লেড বা প্রুনিং কাচি, ঝর্ণা, বালতি, বদনা, মই, সুতলি, তার, পেরেক, হাতুড়ি, পলিথিন ব্যাগ, মাটির, কাঠের বা প্লাষ্টিক টব, হ্যান্ড স্প্রে মেশিন, ইত্যাদি।

সুষম সার ব্যবহারঃ চাষের সময় জমিতে মাটির উর্বরতা শক্তি অনুযায়ী জৈব সার যেমন গোবর বা কম্পোস্ট, খৈল ও হাঁড়ের গুড়া দিতে হবে। প্রয়োজন হলে অনুমোদিত হারে ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ইত্যাদি রসায়নিক সার দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া বরিক এসিড বা বোরাক্স, জিপসাম ও জিংক সালফেট প্রয়োগ করে শাকসব্জি বা শাকসব্জির বীজের ফলন বৃদ্ধি করা যায়। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কৃষি সাবকমিটির সদস্যদের নিকট থেকে সার ব্যবহারের পরিমাণ ও নিয়ম জেনে নিতে হবে।

জৈব সার তৈরী

বসত বাড়ীর নিকটবর্তী সুবিধা মত একটি উঁচু স্থানে দুটি গর্ত করে বাড়ীর পচনশীল যাবতীয় আবর্জনা জমা করুন। গর্তের উপর চালা দিয়ে ঢেকে দিন। দ্রুত পচনের জন্য মাঝে মাঝে জমানো আবর্জনা উল্টে পাল্টে দিন। একটা শক্ত কাঠি দিয়ে ছিদ্র করে ভিতরে বাতাস প্রবেশের সুযোগ করে দেয়া ভালো। শুকিয়ে গেলে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। গর্তের আধাআধি পর্যন্ত ভরে গেলে একমুঠো ইউরিয়া ও একমুঠো টিএসপি দোআঁশ মাটির সাথে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে পারলে ভালো। গর্ত ভরে যাওয়ার তিন মাস পর শাকসব্জির জমি তৈরীর সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিন।

নতুন খামার পদ্ধতিতে শাকসব্জি উৎপাদন

যে সমস্ত কৃষি পরিবারের জমির পরিমাণ কম তারা নতুন খামার পদ্ধতিতে শাকসব্জি উৎপাদন করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বিক্রি করছে। সমন্বিত পানি ব্যবস্থানার মাধ্যমে একই জমিতে ফসল ও মাছ চাষ এবং হাঁস পালন করা যায়। মূল জমিতে ধান ও মাছ চাষ এবং জমির পাড়ে ও উপরে মাচা করে সব্জি ও মসলার চাষ করা হয়। জমির চারিদিকে খাল করে শুষ্ক মৌসুমে মাছের আশ্রয় স্থল ও হাঁস চরার সুবিধা করা হয়। এই পদ্ধতিতে স্বল্প জমিতে খামার করে একটি পরিবার ধান উৎপাদন থেকে নিজেদের খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে এবং মাছ চাষ, শাকসব্জি আবাদ ও হাঁস পালন করে পরিবারের অন্যান্য খরচ মেটাতে পারে। এই খামার পদ্ধতি একটি পরিবারের সারা বছরের কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে।

বাঁশের মাচা করে সব্জি (লাউ, শিম, পুইশাক)

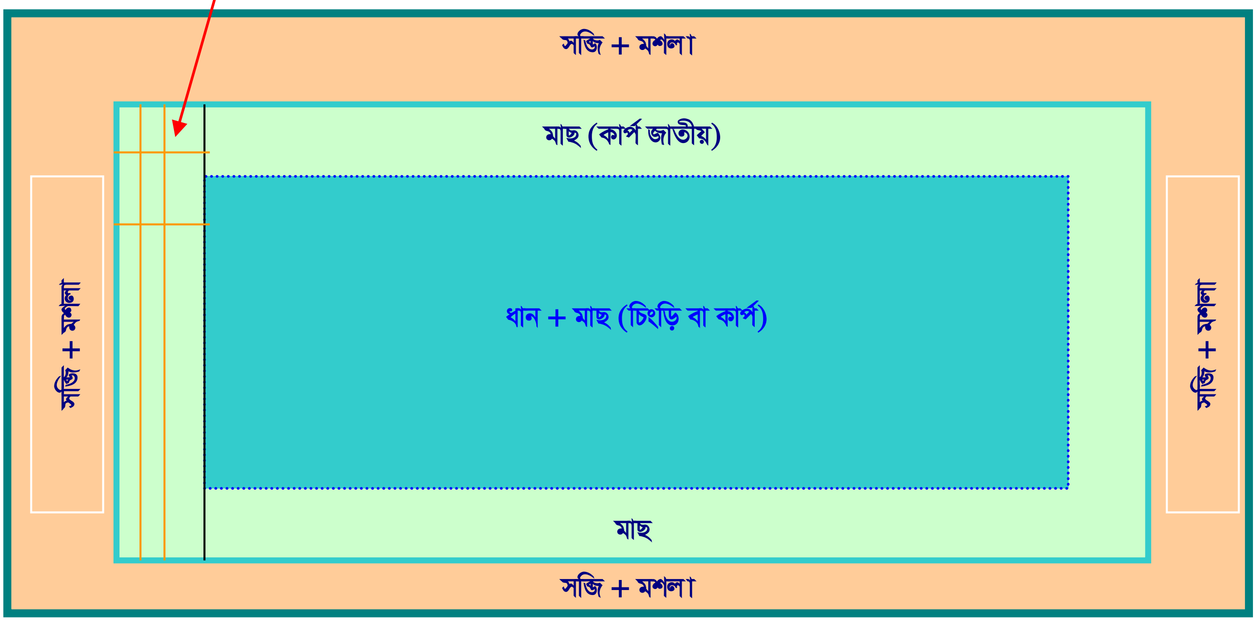

নতুন খামার পদ্ধতি শাকসব্জি উৎপাদন, ধুলিয়া উপ-প্রকল্প, পটুয়াখালী ।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সহযোগিতায় মহিলা সদস্যরা দলবদ্ধভাবে উপ-প্রকল্প এলাকার খালের বা বাঁধের পাড়ে মাচা করে সব্জি উৎপাদন করে আয় বৃদ্ধি করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সব্জি জাত নির্বাচন ও চাষাবাদ পদ্ধতি নির্ধারণে সতর্ক হতে হবে। যাতে করে সব্জি চাষে যেন খালের বা বাঁধের পাড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মাঁচা করে শাকসব্জি আবাদ করলে খালের বা বাঁধের পাড় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা।এছাড়া পানিতে ভাসমান কচুরিপানার স্তুপের উপর মাটি দিয়ে বীজ বপন করেও সব্জি চাষ করা যায়।

খালের পাড়ে মাচা করে সব্জি চাষ,
চিনানাড়ী উপ-প্রকল্প, পাবনা

পরিচর্যা

শাকসব্জি বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। নিচে পরিচর্যা সম্পর্কে মোটামুটি বর্ণনা দেয়া হলো ।

পরিচর্যা পঞ্জি

কার্যক্রম	মাস												
	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ
	চৈত্র	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	
জমি তৈরী													
বীজ বপন													
চারা রোপণ													
আগাছা পরিষ্কার													
চারা পাতলা করা													
উপরি সার প্রয়োগ													
পানি সেচ													
ছাটাই													
মাঁচা তৈরী													
রোগব্যাধি দমন													
পোকামাকড় দমন													
পরাগায়ন													
ফসল সংগ্রহ													

আগাছা পরিষ্কারঃ শাকসব্জির জমিতে কোন আগাছা দেখা গেলে উঠিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। আগাছা জমির খাদ্য ও রস গ্রহণ করে এবং রোগব্যাধি ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বিস্তারে সহায়তা করে।

চারা পাতলা করে দেয়াঃ বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর চারা একটু বড় হলে নির্দিষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে পাতলা করে দিতে হবে। যেন প্রতিটি চারা সমান ভাবে আলো বাতাস এবং মাটি থেকে খাদ্য ও রস পায়। চারা উঠিয়ে বা গোড়া থেকে কেটে পাতলা করা যায়।

উপরি সার প্রয়োগঃ গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে উপরি সার প্রয়োগ করতে হয়। যেমন বেগুন চাষে মোট ইউরিয়া ও এমপি সারের এক-তৃতীয়াংশ জমি তৈরীর সময়, এক-তৃতীয়াংশ পিটে বা গর্তে এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ তিন কিস্তিতে রোপণের ২১ দিন পর, ৩৫ দিন বা ফুল আসার পর এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করলে ফলন ভালো হয়। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কৃষি সাবকমিটির সদস্যদের থেকে উপরি সার ব্যবহারের নিয়ম জেনে নিতে হবে।

পানি সেচঃ বপন বা রোপণের পর জমির মাটি সব সময় রসালো রাখতে হবে, তবে অতিরিক্ত নয়। বৃষ্টিপাত, মাটির অবস্থা, বপন বা রোপণ পদ্ধতি, সব্জির জাত বা ধরণের উপর ভিত্তি করে পানি সেচ দিতে হবে। পানি ধীরে ধীরে ছিটিয়ে দিতে হবে। সজোরে সেচ দিলে বীজ বা চারা উঠে যেতে পারে। টিনের পাত্র, মাটির কলসী বা প্লাষ্টিকের বোতলের তলায় ছোট ছোট ছিদ্র করে পানি ভরে সেচ দেয়া যায়। পানি সেচের পর জৈব সার গুঁড়া করে হালকা ছিটিয়ে দিলে পানি সহজে বাষ্পিভূত হয়ে উড়ে যেতে পারবে না। পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণও কমে যায়। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সব্জি গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকা ক্ষতিকর।

ছাটাইঃ চারা বড় হলে ছাটাই করে গাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ রাখতে হবে। অতিরিক্ত ডালপালা ছেটে দিয়ে সেচ পানির অপচয় রোধ করতে হবে। চারার কোন অংশে ছাটাই করতে হবে তা নির্ভর করবে কি ধরণের সব্জি তার উপর। যেমন ডাটা গাছে ফুল হলে ভেঙ্গে দিতে হবে নতুবা পাতা ধারন ক্ষমতা কমে যাবে। এ ক্ষেত্রে ফুল আসার আগে চারার ডগা ছেটে দেয়া ভালো। আর ফুল এসে গেলে ফুলের মাথা ছেটে দেয়া ভালো, টমেটো বা বেগুনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডালপালা ছেটে দিতে হবে। এক্ষেত্রে গাছের ডগা মোটেও ভাঙ্গা যাবে না। কারণ ফুল আসতে ব্যাঘাত হবে। ফল হওয়ার পর পেঁপে পাতলা করে দিলে অবশিষ্ট পেঁপে আকারে বড় হবে এবং দেখতে ভালো হবে। ডালপালা ছেটে দিলে রোগব্যাধি ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়। ছাটাই এর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছের কোন ক্ষতি না হয়। হাতের আঙ্গুল দিয়ে ভেঙ্গে ছাটাই করা যায়। ডালপালা বড় হলে বা ভাঙ্গতে সমস্যা হলে ধারালো ছুরি, ব্লেড বা প্রুনিং কাঁচি দিয়ে ছাটাই করা ভালো।

মাচা তৈরীঃ গাছের ডাল, বাঁশের কঞ্চি বা চটা, সুতোর জাল, তার ব্যবহার করে মাচা বা ইংরেজি A অক্ষরের মত বাউনি করে গাছের লম্বালম্বি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যায়। কুমড়া জাতীয় শাকসব্জি, শিম, এমনকি টমেটো চাষে মাচার এবং করলা ও উচ্ছে চাষে বাউনির উপকারিতা অনেক বেশী। পোকা মাকড় ও রোগ ব্যাধির আক্রমণ কম হয়। সব্জির গুণাগুণ ভালো থাকে, মাটিতে লেগে পচে যাওয়ার আশংকা থাকে না। মাচা তৈরীর সময় খেয়াল রাখতে হবে বাতাসে বা ঝড়ে যেন ভেঙ্গে না পড়ে।

কৃত্রিম পরাগায়ন

লাউ, কুমড়া, কাঁকরোল জাতীয় সব্জি গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা ভাবে উৎপন্ন হয়। পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের মধ্যে পোকামাকড়ের মাধ্যমে পরাগায়ন হয়। অনেক সময় পোকামাকড়ের অভাবে সঠিকভাবে পরাগায়নের অভাবে ফল ধারণ আশানুরূপ হয় না। ফলে কৃত্রিম পরাগায়নের প্রয়োজন হয়। এ পদ্ধতিতে পুরুষ ফুলের পরাগরেণু স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরে লাগিয়ে দিতে হয়। সাধারণত চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পরে পুরুষ ফুল ও ৬০-৬৫ দিন পরে স্ত্রী ফুল ফুটে। বিকেলের দিকে সদ্য ফোটা ফুল উম্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তুলে পাঁপড়িগুলো ছিড়ে নিতে হবে। এরপর স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডুর আঁঠালো অংশে পুরুষ ফুলের পুংকেশরটি আস্তে করে ২-৩ বার ছুঁয়ে পরাগ রেণু লাগিয়ে দিতে হয়। এভাবে একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৫-৬ টি স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করা যায়। পরাগায়নের জন্য গাছের জীবন চক্র ও ফুলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিকট থেকে ভালোমত জেনে নিতে হবে।

কুমড়ার পুরুষ ফুল

গাজীপুর জেলায় নালিজুরি উপ-প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মহিলা সদস্যকে পরাগায়ন প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে স্থানীয় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা

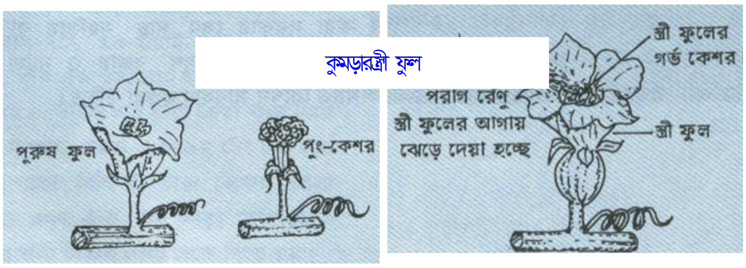

কুমড়ারস্ত্রী ফুল

লাউ, কুমড়া, শসা, বেগুন ও মরিচ গাছে ২জি/৩জি/৪জি পদ্ধতিতে নতুন ডগা/শাখা উৎপন্ন করে ফলন বৃদ্ধি

২য় ডগা কেটে দিলে ৩য় ডগার প্রতি পাতা থেকে লাউ ধরবে।

কুশী কেটে দিলে ২য় বা ৩য় ডগা বের হবে।

অতিরিক্ত ডগা কেটে দিলে ২য় বা ৩য় ডগা বের হবে।

মূল ডগা বা শাখার অতিরিক্ত ডগা কেটে দিলে ৩য় ডগা বের হবে।

বাড়তি ডগা কেটে দিলে ২য় বা ৩য় ডগা বের হবে।

অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধি বা বালাই দমনঃ শাকসব্জির অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধি বা বালাই দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম প্রয়োগ করতে হবে। এ ব্যাপারে নিজ এলাকার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করতে হবে। নিচে আইপিএম পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

চাষাবাদ

- বংশগত ভাবে সহজে বালাই এ আক্রান্ত হয় না এমন জাতের শাকসব্জি নির্বাচন।

বেগুন	উত্তরা, কাজলা, তারাপুরী, নয়নতারা ঢলে পড়া রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না। কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ কম হয়।
টমেটো	মানিক, রতন, চৈতী, অপূর্ব, শিলা, লালিমা ও অনুপমা ঢলে পড়া রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না ।
শিম	বারি শিমঃ ভাইরাস রোগে সহজে আক্রান্তহয় না ।
ঢেঁড়স	বারি ঢেঁড়স ১ঃ হলুদশিরা ভাইরাস রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না ।
মটরশুটি	বারি মটরশুটি ১ঃ ডাউনি মিলডিউ ও পাউডারি রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না ।
আলু	হীরা, আইলসা, ডায়ামন্ট, কার্ডিনাল ও চমকঃ মড়ক ও ভাইরাস রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না ।
মিষ্টিআলু	দৌলতপুরী (বারি মিষ্টিআলু ৩), বারি মিষ্টিআলু ৪, বারি মিষ্টিআলু ৫ঃ উইভিলের আক্রমণ কম হয়।

- বালাইমুক্ত বীজ ও চারা ব্যবহার। প্রয়োজনে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে বালাই মুক্ত করে নেয়া।
- জৈব সার ব্যবহার। এতে মাটির গঠন ও গাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকায় বালাই বিস্তারে ব্যাঘাত ঘটে।
- অতি মাত্রায় সার ব্যবহার না করা। এতে গাছের অতিরিক্ত বৃদ্ধিতে বালাই বিস্তারের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- একই স্থানে বা জমিতে একসাথে বিভিন্ন শাকসব্জির আবাদ।
- এক এক মৌসুমে ও বছরে বিভিন্ন শাকসব্জির আবাদ।
- মূল শাকসব্জির ফাঁকে ফাঁকে বালাই পছন্দশীল ফসল চাষ। যেমন জাব পোকার পছন্দ তামাক গাছ।

বপন ও রোপণ

- এক এক ধরনের শাকসব্জি বিভিন্ন সময়ে বপন ও রোপণ।
- সাঠিক সময় ও দূরত্বে বপন বা রোপণ। বিলম্বে বা ঘন বপনে বা রোপণে বালাই বিস্তারের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে শোষক পোকা, পাতা খেকো ও ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ বেশী হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

- জমি পরিষ্কার পরিŽ ছন্ন ও আগাছা মুক্ত রাখা। আগাছায় জাবপোকা আশ্রয় নিয়ে ভাইরাস রোগ ছড়ায়।
- উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থাপনা।
- কর্তনের পর ফসলের গোড়া ও অন্যান্য অবশিষ্ট পুড়িয়ে ফেলা। এতে জমি বালাইমুক্ত থাকে।

উপকারী পোকামাকড় ও প্রাণী সংরক্ষণঃ অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ দমনে নিজ এলাকায় উপকারী পোকামাকড় ও প্রানী সংরক্ষণ এবং তাদের বংশবিস্তারে সহায়তা করা প্রয়োজন। যেমন বিটল, উড়চুঙ্গা, ঘাসফড়িং, মাছি, বোলতা, লাল পিঁপড়া, মাকড়সা, ব্যাঙ, শালিক, ফিংগে, গুইসাপ ও পেঁচা অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ এবং তাদের ডিম, কীড়া ও পুত্তলি ধরে খায়। দেশী শিম, শসা বা অন্যান্য রঙিন ফুলের সজি চাষ করে, জমির আইলে খড় বিছিয়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে উপকারী পোকামাকড় সংরক্ষণ ও বংশবিস্তার করা যায়। এদের ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে শাকসজির জমিতে মুক্ত করে দিতে হবে। পাখি বসার জন্য বাঁশের খুঁটি পুঁতে রাখতে হবে।

উপকারী পোকামাকড়

লেডীবার্ড বিটল এ্যাসাসিন বাগ
ক্যারাবিড বিটল ক্যারাবিড বিটল

ড্যামসেল ফ্লাই ইয়ার উইগ প্রেয়িং ম্যানটিড

জাম্পিং মাকড়সা নেকড়ে মাকড়সা নেকড়ে মাকড়সা লিংক্স মাকড়সা লিংক্স মাকড়সা

অর্ব মাকড়সা ডোয়ার্ফ মাকড়সা মাইক্রোভেলিয়া ঘাস ফড়িং ঘাস ফড়িং

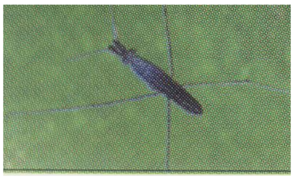

বোলতা টাইগার বিটল ড্রাগন ফ্লাই ওয়াটার স্ট্রাইডার উড়চুঙ্গা

শাকসব্জির অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ

জাবপোকা

শিম, বেগুন, ঢেঁড়শ, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও টমেটোতে আক্রমণ করে।

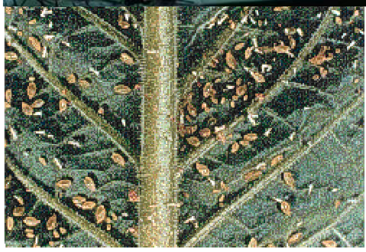

মাছিপোকা ও পোকার ম্যাগোট

লাউ, কুমড়া, কাকরোল, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা,শসা, ধুন্দল, গাজর ও বাঁধাকপির ক্ষতি করে।

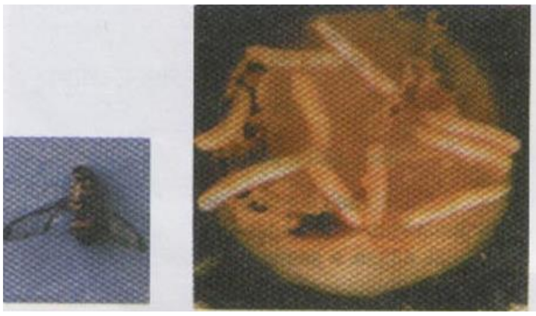

লাল পাম্পকিন বিটল

লাউ, কুমড়া, চাল কুমড়া, কাঁকরোল, করলা ও শসার ক্ষতি করে।

মাজরা পোকা

বেগুন ও ঢেঁড়শের ক্ষতি করে।

শাকসব্জির অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ

ইপিল্যাকনা বিটল

বেগুনের ক্ষতি করে।

মিলিবাগ

বেগুনের ক্ষতি করে।

রেডমাইট

বেগুনের ক্ষতি করে।

জ্যাসিড

বেগুনের ক্ষতি করে।

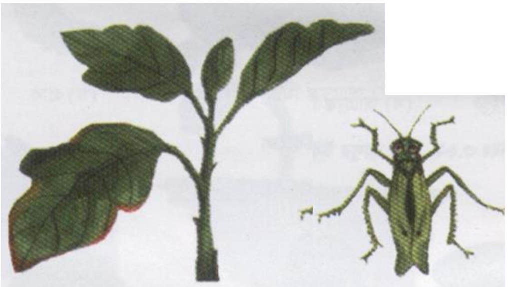

ছাতরা পোকা

বেগুনের ক্ষতি করে।

পাতা মোড়ানো পোকা

বেগুনের ক্ষতি করে।

শাকসব্জির অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ

কাটুই পোকা
(কাটওয়ার্ম)

ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু ও বেগুনের ক্ষতি করে।

সুতলী পোকা
(টিউবার ওয়ার্ম)

আলুর ক্ষতি করে।

উইভিল

মিষ্টি আলুর ক্ষতি করে।

ডগা ছিদ্রকারী পোকা

মিষ্টি আলুর ক্ষতি করে।

ছিদ্রকারী পোকা

টমেটোর ক্ষতি করে।

হর্ণওয়ার্ম

টমেটোর ক্ষতি করে।

ডায়মন্ড ব্যাকমথ

ফুলকপির ক্ষতি করে।

শাকসব্জির বাগানে বালাই এর আক্রমণ হলে

হাত জালে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ধরে ও তাদের ডিম বা কীড়া নষ্ট করে দেয়া।

রাত্রে শাকসব্জির জমিতে হারিকেন টাঙ্গিয়ে বা আলোর ফাঁদ পেতে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ধরা।

সৌর শক্তি চালিত আলোক ফাঁদঃ ফসলের মাঠে সৌর শক্তি চালিত আলোক ফাঁদ অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ দমন করা যায়। বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়ায় রাত্রে এই আলোক ফাঁদ ব্যবহার করা যায়। দিনে সূর্যালোকে এই ফাঁদের ব্যাটারি চার্জ হয়। রাত্রে ৫-৬ ঘন্টা অলোকিত করে। আলোতে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে নিচে রাখা পাত্রে পানির সাথে সাবানের গুঁড়া পাউডার বা তরল ডিটারজেন্ট মিশ্রণে আটকে যায়। সৌর শক্তির পরিবর্তে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা আলো জ্বালিয়ে একই পদ্ধতিতে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ দমন করা যায়।

পানি দিয়ে দমনঃ বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি শাকসব্জির চারার গোড়া থেকে ১৫ সেন্টিমিটার দূরে আঙ্গুল দিয়ে বৃত্তকার নালায় পানি ভরে কাটুই পোকার আক্রমণ থেকে গাছ রক্ষা করা যায়। জাব পোকায় আক্রান্ত সব্জী গাছ পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিলে বা ছাই ছিটিয়ে দিলে আক্রমণ কম থাকে।

নিম দিয়ে দমনঃ নিমের পাতা ও বীজ পানিতে মিশিয়ে শাকসব্জি ক্ষেতে ছিটিয়ে বালাই দমন করা যায়।

তামাক দিয়ে দমনঃ তামাকের সতেজ অথবা শুকনা পাতা পানিতে ভিজিয়ে শাকশব্জির পোকা দমনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাথী ফসল চাষাবাদ করে দমনঃ শাক সবজীর বাগানে মাঝে মাঝে তামাকের চাষাবাদ করা হলে জাব পোকার আক্রমণ কম হবে।

সাবানের পানি দিয়ে দমনঃ পাউডার অথবা তরল ডিটারজেন্ট সাবানের পানি প্রয়োগ করলে জাব পোকা মারা যায়। সাধারণত প্রতি লিটার পানিতে ৫-৮ গ্রাম সাবানের গুঁড়া পাউডার বা তরল ডিটারজেন্ট মিশ্রণ জাব পোকা ও ছোট কীড়া দমন কার্যকর। অধিক মাত্রায় সাবানের মিশ্রণ অর্থাৎ লিটার প্রতি ১০ গ্রামের উপরে ব্যবহার করলে গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হবে বা মারা যাবে। এজন্য অনেক কৃষক আগাছা দমনের জন্য (ফসলবিহীন স্থানে) সাবানের পানি ব্যবহার করে থাকে।

মরিচের গুঁড়া দিয়ে দমনঃ মরিচের গুঁড়া ঠান্ডা পানিতে একরাত্র ভিজিয়ে পরের দিন কাপড়ে সেকে স্প্রে করতে হবে। এই মিশ্রণের সাথে অল্প সাবানের পানি মেশানো যেতে পারে। বৃষ্টি না থাকলে সপ্তাহে একবার প্রয়োগ করতে হবে। যদি বৃষ্টি থাকে তবে সপ্তাহে ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

হাতে ধরে দমনঃ পোকা অথবা রোগে আক্রান্ত শাকসজ্জির পাতা, ডগা, কান্ড ও ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা, কীড়া ও ডিম সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে দিলে ক্ষতিকারক পোকার সংখ্যা কম থাকবে। বেগুন চারা লাগানোর পনের দিন অন্তর অন্তর ডগা ও ফলের পোকা দ্বারা আক্রান্ত ডগা সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। ইপিল্যাকনা পোকার ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করলে বেগুন অথবা অন্যান্য শাক সজ্জির ক্ষতি করতে পারে না। এ পোকার কীড়া প্রথমে কয়েকটি গাছে থাকে। এ সময় সংগ্রহ করে নিধন করা হলে সজ্জির ক্ষতি করতে পারে না এবং দমন খরচ কম হবে।

সজ্জি ও ফলের মাছি পোকা দমন ব্যবস্থাপনাঃ কাঁকরোল, লাউ ও কুমড়া প্রভৃতি ফলের জমিতে কাঁঠালের ভোতা বেধে রাখলে ফলের মাছি পোকা ঐ ভোতায় ডিম পাড়বে। ফলে ডিম থেকে কীড়া বের হতে পারবে না অথবা বের হলেও মারা যাবে। এতে করে মাছি পোকার আক্রমণ কম হবে।

বালাইমুক্ত শিম ও বেগুনের গাছ

বালাইনাশক ব্যবহারঃ উপকারী ও অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের সংখ্যা যাচাই করে বালাইনাশক প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শাকসজ্জির বাগানে উপকারী পোকার সংখ্যা অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের তুলনায় বেশী হলে বালাইনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। আর অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের সংখ্যা বেশী হলে সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন করে, অনুমোদিত মাত্রায়, যথাসময়ে প্রয়োগ করতে হবে। কম মাত্রায় অথবা ঘন ঘন বালাইনাশক প্রয়োগে পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উপকারী পোকা বেশী মারা যায়। গাছের ক্ষতি হয়। পরিবেশের দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কীটনাশক ব্যবহারের সময় গাছের প্রতিটি অংশ ভিজিয়ে দিতে হবে। কারণ অনেক পোকা পাতার নীচে লুকিয়ে থাকে।

সুপারিশকৃত বালাইনাশক প্রয়োগ

জাব পোকাঃ প্রতি লিটার পানির সাথে এক গ্রাম পাইরিমর ৫০ ডিপি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এই বালাইনাশক কম বিষাক্ত। উপকারী পোকার ক্ষতি কম হয়। ফসলে ফুল আসার সময়ে ব্যবহার করা যায়।

ইপিল্যাকনা বিটলঃ প্রতি লিটার পানির সাথে দুই গ্রাম সেভিন বা কারবারিল ১৮৫ ডবি-উপি মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করা যেতে পারে।

ডগা ও ফলের ছিদ্রকারী পোকাঃ প্রতি লিটার পানির সাথে এক মিলিলিটার রিপকর্ড বা সিমবুশ বা বাসথ্রিন ১০ ইসি স্প্রে করা যেতে পারে । সঠিক মাত্রায় ১৫ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

রেড মাইটঃ প্রতি লিটার পানির সাথে এক মিলিলিটার টরকিউ ৫০ ইসি অথবা নিউরন ৫০ ইসি মিশিয়ে রেড মাইট আক্রান্ত গাছে স্প্রে করা যেতে পারে।

কাটুই পোকাঃ এক গ্রাম সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি অথবা পাদান ৫০ এসপি আধা কেজি ধান বা আটার ভূষির সাথে প্রয়োজন মত পানি মিশিয়ে বিষটোপ তৈরী করে এক শতক জমির কাটুই দমন করা যায়। চারা গাছের লাইনে বিষটোপ ছিটিয়ে দিতে হবে।

বিছা পোকাঃ বাধাকপি ও ফুলকপির পাতা খেকো বিছা পোকা দমনের জন্য দুই মিলিলিটার মেলোথিয়ন ৫৭ ইসি দুই লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পাম্পকিন বিটলঃ দুই গ্রাম সেভিন বা কারবারিল ১৮৫ ডব্লিউপি এক লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিষক্রিয়ার মেয়াদ বা অপেক্ষমান সময়ের উপর ভিত্তি করে পুনঃপ্রয়োগ, শস্য সংগ্রহ, খাওয়া ও বাজারজাতকরণ নির্ধারণ করতে হবে। শাকসব্জি ক্ষেতে স্বল্প মেয়াদী কীটনাশক প্রয়োগ করা নিরাপদ। বিষক্রিয়ার সময় উর্ত্তীণ না হওয়া পর্যন্ত শাকসব্জি শস্য সংগ্রহ, খাওয়া ও বাজারজাত করা উচিত নয়। এতে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়ে থাকে। যেমন ডায়াজিনন ও মেলোথিয়ন প্রয়োগ করার পর ৭ দিন পর্যন্ত• বিষক্রিয়া থাকবে। উক্ত সময় পার হলে শস্য সংগ্রহ করা যাবে এবং ফসলে বালাই এর সংখ্যা যাচাই করে পুনঃপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে হবে। বিষক্রিয়ার মেয়াদ বা অপেক্ষমান সময় বালাইনাশকের বোতল, টিন বা প্যাকেটে লেখা থাকে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা

- বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে স্থানীয় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কতৃক অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার।
- সুপারিশকৃত হারে স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ ।
- ছিটানোর সময় শরীর, নাক ও মুখ কাপড়ে আবৃত রাখা ।
- ছিটানোর সময় আহার ও পান থেকে বিরত থাকা।
- ছিটানোর পর কাপড় দ্রুত পরিবর্তন ও পরিষ্কার করা ও সাবান ব্যবহার করে গোসল করা।
- বালাইনাশকে কোন পানি যেন বিষাক্ত না হয়।
- হাঁসমুরগী, পশুপাখি, মাছ, মৌমাছিসহ কোন জীব যেন বালাইনাশকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- বালাইনাশক ও স্প্রেযন্ত্র নিরাপদ স্থানে, বিশেষ করে পানি ও খাবার এবং শিশুর নাগালের বাইরে রাখা ।
- বালাইনাশক ব্যবহৃত পাত্র অন্য কোন কাজে ব্যবহার না করা ও নিরাপদ স্থানে রাখা।
- বালাইনাশক শেষ হলে খালি বোতল, টিন বা কাগজের প্যাকেট ধ্বংস করা।
- সদ্য বালাইনাশক ছিটানো কৃষিজাত পণ্য খাওয়া বা বাজারজাত না করা।
- বালাইনাশক ব্যবহার শেষে স্প্রেযন্ত্র ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা।

শাকসব্জির চাষাবাদ পদ্ধতি

পালং শাক

দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি । যে কোন জাত চাষ করা যাবে। ভাদ্র থেকে শুরু করে পৌষ মাস পর্যন্ত বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ১০ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় প্রতি শতকে ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি খৈল, ৪০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০ গ্রাম টিএসপি ও ১৫ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। জমি তৈরীর ৭ দিন পর বপন বা রোপণ করা ভালো। বপন বা রোপণে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২৫ সেন্টিমিটার এবং বীজ বা চারার মধ্যেকার দূরত্ব হবে ২০ সেন্টিমিটার। বপনের ১৫ দিন পরে ৪০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১৫ গ্রাম এমপি দিতে হবে। প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। বপনের পর ৪৫-৬০ দিন পর্যন্ত পালং শাক সংগ্রহ করা যায়।

পুঁই শাক

দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। লাল বা সাদা জাতের চাষ হয়ে থাকে। ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ৬ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৬০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৫০০ গ্রাম খৈল, ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪০০ গ্রাম টিএসপি ও ৪০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। তবে সরাসরি মাদায় চাষ করলে প্রতি গর্তে ৬ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৫০ গ্রাম খৈল, ৪০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪০ গ্রাম টিএসপি ও ৪০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। জমি বা মাদা তৈরীর ৭ দিন পর বপন বা রোপণ করা ভালো। জমিতে বপন বা রোপণ দূরত্ব হবে সারি থেকে সারি ১০০ সেন্টিমিটার ও বীজ বা চারার মধ্যে দূরত্ব থাকবে ৫০ সেন্টিমিটার। চারা ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা হলে আগা কেটে দিলে একাধিক শাখা বের হয়ে ঝোপের মত হবে। পুনরায় শাখা বের হলে একইভাবে আগা কেটে দিলে ভালো। শাখা প্রশাখা বিস্তারের জন্য মাচা করে দেয়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে হালকা সেচ দিতে হবে। ফুল না আসা পর্যন্ত শাক সংগ্রহ করা যাবে। পুঁই শাক গাছের জীবন কাল ৬০ থেকে ১৫০ দিন।

লেটুস

হালকা দোআঁশ সবচেয়ে উপযোগী মাটি। প্রাইজ হেড, সালাদ বউল জাত ভালো। ভাদ্র থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ৬ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় প্রতি শতকে ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি খৈল, ৪০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০ গ্রাম টিএসপি ও ২০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। জমি তৈরীর ৭ দিন পরে দিনের চারা রোপণ করতে হবে । রোপণের সময় সারি থেকে সারি দূরত্ব হবে ৪০ সেন্টিমিটার ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার। চারা বড় হলে শতক প্রতি ৪০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০ গ্রাম এমপি সার পুনরায় গাছের গোড়ার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। লেটুস গাছের জীবন কাল ৩০-৫০ দিন।

লাল শাক

বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। সারা বছর চাষ করা যায় । এ ক্ষেত্রে গ্রীষ্ম মৌসুমে পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে। শীত মৌসুমে ফলন ভালো হয়। বারি লালশাক-১ ভালো জাত । প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ২ গ্রাম।। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি খৈল, ৮০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪০ গ্রাম টিএসপি ও ৪০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। জমি তেরীর ৭ দিন পরে বিশ সেন্টিমিটার দূরত্বে

সারি করে ২ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ ঘন করে বপন করতে হবে। তবে বীজ গজানোর ৭ দিন পরে ৫ সেন্টিমিটার অন্তর ভালো চারাগুলো রেখে বাকী চারাসমূহ তুলে দিতে হবে। প্রয়োজনে হালকা সেচ দিতে হবে। বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পর শাক খাওয়ার উপযুক্ত হবে। বীজ উৎপাদনের জন্য ১১০-১৩০ দিন লাগবে।

বাটি শাক

সব ধরনের মাটি উপযোগী। বেলে দোআঁশ হলে ভালো । বারি বাটিশাক উলে- খযোগ্য জাত। সারা বছর চাষ করা

যায়। বীজ উৎপাদনের জন্য শীতকালে চাষ করতে হবে। বীজের চাহিদা প্রতি শতক জমিতে ৫ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৬০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। বীজ ঘন করে ২০ সেন্টিমিটার অন্তর সারিতে বপন করতে হবে। চারা বড় হলে ২০ সেন্টিমিটার অন্তর পাতলা করে দিতে হবে। পরিমিত সেচ দিতে হবে। বাটি শাক বীজ বোনার ৪০-৪৫ দিন পর খাওয়ার উপযুক্ত হবে । বীজ উৎপাদনের জন্য ১১০-১২০ দিন লাগবে।

ডাঁটা

বেলে দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। সুরেশ্বরী, আমনী, কাটোয়া উল্লেখযোগ্য জাত। ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বপন করা যায়। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ৬ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি খৈল ও ৪০০ গ্রাম টিএসপি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপন দূরত্ব সারি থেকে সারি ৩৫ সেন্টিমিটার ও বীজ থেকে বীজ ২ সেন্টিমিটার। গজানোর পর চারা ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে পাতলা করে দিতে হবে। এ সময় শতক প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। পাতলা করার সময় উঠানো চারা খাওয়া যাবে। চারা বয়স ২০ দিন হলে শতক প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। পুনরায় হালকা সেচ দিতে হবে। বপনের ৪০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যাবে।

বেগুন

এটেল দোআঁশ, দোআঁশ বা পলি উপযোগী মাটি। ইসলামপুরি, শিংনাথ, উত্তরা, নয়নতারা, কাজলা, তারাপুরি, ইশ্বরদি-১, ডিম বেগুন, তাল বেগুন, খটখটিয়া ইত্যাদি জাতের চাষ হয়ে থাকে। ভাদ্র থেকে আশ্বিন, ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ৭ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় প্রতি শতকে ২৫ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি খৈল, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০ গ্রাম টিএসপি ও ৩০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। এরপর জমিতে ৭০ সেন্টিমিটার দূরত্বে পিট বা গর্ত তৈরী করে ৩৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের ৭ দিন আগে শতক প্রতি ২৫ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি খৈল, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৩০ গ্রাম এমপি সার সমানভাবে ভাগ করে প্রতি গর্তে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের ২১ দিন পর শতক প্রতি ১৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০ গ্রাম এমপি সার নিয়ে সমানভাবে প্রতিটি গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। পুনরায় চারা রোপণের ৩৫ দিন পর শতক প্রতি ১৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০ গ্রাম সার নিয়ে সমান ভাবে প্রতিটি গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের ৫০ দিন পরে আর একবার শতক প্রতি ১৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০ গ্রাম এমপি সার একই ভাবে গর্তে প্রয়োগ করা ভালো। খরার সময় সেচ দিতে হবে। বীজ বপনের ৯০-১২০ দিন পর বেগুন সংগ্রহ করা যায়। বেগুন গাছের জীবন কাল ১৩০-১৮০ দিন।

টমেটো

দোআঁশ সবচেয়ে উপযোগী মাটি। বারি জাতসমূহ উল্লেখযোগ্য। যেমন বারি টমেটো-১ (মানিক), বারি টমেটো-২ (রতন) বারি টমেটো-৩, বারি টমেটো-৮, বারি টমেটো-৫, বারি টমেটো-৬ (চৈতী), বারি টমেটো-৭ (অপূর্ব), বারি টমেটো-৮ (শিলা), বারি টমেটো-৯ (লালিমা) ও বারি টমেটো-১০ (অনুপমা)। কার্তিক থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। চারা উৎপাদনে প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ১ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ২৫ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৫০০ গ্রাম খৈল ও ২ কেজি টিএসপি সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ৮০ সেন্টিমিটার দূরত্বে পিট বা গর্ত করে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের আগে শতক প্রতি ২৫ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ৫০০ গ্রাম খৈল নিয়ে সমান ভাবে ভাগ করে প্রতিটি পিট বা গর্তে দিতে হবে। রোপণের সময় চারার বয়স ২৫ দিন হলে ভালো। চারা রোপণের পর পুনরায় সার দিতে হবে। শতক প্রতি ২ কেজি ইউরিয়া ও ১ কেজি এমপি সার দুই কিস্তিতে ২১ ও ৩৫ দিন পরে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে হালকা সেচ দিতে হবে। চারা রোপণের ৭৫-৮০ দিন পর ফল পাকা শুরু হবে।

পলিথিন ছাউনিতে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন টমেটো চাষ

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বারি টমেটো-৪, ৫, ৬ ও ৯ জাতসমূহ পলিথিনের ছাউনিতে আবাদ করা যায়। বাঁশের খুটির সাথে নাইলনের দড়ি বা পাটের সুতলি দিয়ে স্বচ্ছ পলিথিন নৌকার ছইয়ের আকৃতিতে বেঁধে ছাউনি তৈরী করা যাবে। ছাউনির পাশের খুটির উচ্চতা হবে ১৫০ সেন্টিমিটার এবং মাঝখানের খুটির উচ্চতা হবে ২১০ সেন্টিমিটার। পলিথিন যাতে বাতাসে উড়ে না যায় সেজন্য ছাউনির উপর দিয়ে উভয় পার্শ্ব থেকে আড়াআড়িভাবে দড়ি পেচিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি ২টি ছাউনির মাঝে ৭৫ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে যাতে করে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।প্রতিটি ছাউনির নিচে ২টি বেড বা বীজতলা প্রস্তুত করতে হবে। জমিতে মাটি ২০ সেন্টিমিটার উঁচু করে এই বেড প্রস্তুত করে নিতে হবে। দুই বেডের মাঝে ৩০ সেন্টিমিটার চওড়া নালা থাকবে।প্রতিটি বেডে ২৫ দিন বয়সের চারা ২ টি সারিতে লাগাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৪০ সেন্টিমিটার। টমেটোর ফলন বৃদ্ধির জন্য টমেটোটোন নামক এক ধরনের হরমোন প্রয়োগ করতে হবে। স্প্রেয়ারের সাহায্যে প্রতি লিটার পানিতে ৫ চা চামচ টমেটোটোন মিশিয়ে ৮০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে। এ ভাবে সারা বছর টমেটো চাষ করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটোটোন দ্বারা উৎপাদিত টমোটোতে বীজ হয় না। ফলে এ সমস্ত জাতের টমেটোর বীজ উৎপাদনের জন্য শীতকালে চাষ করতে হবে।

ঢেঁড়শ

বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ উপযোগী মাটি। পুশাসাওয়ানী, পেন্টাগ্রীন ও গোল্ডকোস্ট উল্লেখযোগ্য জাত। ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ২০ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৭৫ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২ কেজি খৈল, ২৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৩০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। চারা রোপণ দূরত্ব হবে সারি থেকে সারি ৫০ সেন্টিমিটার ও বীজ থেকে বীজ ৪০ সেন্টিমিটার। হালকা সেচ দিতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বীজ বোনার ৪০ থেকে ৫০ দিনের মধ্যে গাছ থেকে ঢেঁড়শ সংগ্রহ করা যাবে। গাছ রোগাক্রান্ত না হলে ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল দিতে থাকে। ঢেঁড়শ গাছের জীবন কাল ১২০-১৫০ দিন।

করলা

বেলে দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। যে কোন জাতের করলা চাষ করা যাবে। পৌষ মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বীজ বপন বা চারা রোপণ করা যাবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ২০ গ্রাম। মাদা তৈরী করে বা জোড়া সারি করে বীজ বপন করতে হবে। মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ৪০০ সেন্টিমিটার। আর জোড়া সারির মধ্যে দূরত্ব হবে ১০০ সেন্টিমিটার।

প্রতি সারিতে ১০০ সেন্টিমিটার অন্তর বীজ বপন করতে হবে। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম খৈল ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সমান ভাবে ভাগ করে প্রতি মাদায় দিতে হবে। চারা বড় হলে শতক প্রতি ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪৫০ গ্রাম এমপি সার সমান তিন কিস্তিতে মাদায় বা সারিতে চারা গোড়ায় দিতে হবে। বড় করলা চাষে গাছের ডাল, বাঁশের কঞ্চি বা চটি দিয়ে ইংরেজি A অক্ষরের মত ফ্রেম বা বাউনি দিলে গাছের বৃদ্ধি ও বিস্তারে সহায়তা হবে। প্রয়োজনে হালকা সেচ দিতে হবে। বীজ বোনার ৪৫-৫০ দিন পরে ফল দিতে শুরু করবে।

উচ্ছে

বেলে দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। যে কোন জাতের চাষ করা যাবে। পৌষ মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে মাদা করে ১৫ গ্রাম ও জোড়া সারি করে ১০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হবে। মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ২৫০ সেন্টিমিটার। আর জোড়া সারির মধ্যে দূরত্ব হবে ১০০ সেন্টিমিটার। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম খৈল ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সমান ভাবে ভাগ করে প্রতি মাদায় দিতে হবে। চারা গজানোর পর শতক প্রতি ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪৫০ গ্রাম এমপি সার ১০-১৫ দিন অন্তর সমান তিন কিস্তিতে মাদায় দিতে হবে। বড় করলা চাষে গাছের ডাল, বাঁশের কঞ্চি বা চটি দিয়ে ইংরেজি A অক্ষরের মত ফ্রেম বা বাউনি দিলে গাছের বৃদ্ধি ও বিস্তারে সহায়তা হবে। প্রয়োজনে হালকা সেচ দিতে হবে। বীজ বোনার ৪৫-৫০ দিন পরে ফল দিতে শুরু করবে।

মিষ্টিকুমড়া

দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। স্থানীয় জাতের চাষ করা যাবে । মাঘী ফসলের জন্য কার্তিক মাসে, বৈশাখী ফসলের জন্য ফাল্গুন মাসে ও বর্ষাতি ফসলের জন্য বৈশাখ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপন করতে হবে। প্রতি শতকে বীজের চাহিদা ৫ গ্রাম। প্রতি মাদায় ৫ টি বীজ বপন করে গজানোর পর ৩ টি সুস্থ চারা রাখতে হবে। মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ৩০০ থেকে ৪০০ সেন্টিমিটার। মাদায় সার প্রয়োগের ১০ দিন পরে বীজ বপন করতে হবে। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার দিতে হবে। এরপর শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম খৈল ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার নিয়ে সমান ভাগ করে প্রতিটি মাদায় দিতে হবে। চারা একটু বড় হলে ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪৫০ গ্রাম এমপি সার ১০-১৫ দিন অন্তর দুই থেকে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে মিষ্টিকুমড়ার ফলন বৃদ্ধি করা যায়। চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পরে পুরুষ ফুল ও ৬০-৬৫ দিন পরে স্ত্রী ফুল ফুটে। বিকেলের দিকে সদ্য ফোটা ফুল উম্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তুলে পাঁপড়িগুলো ছিড়ে নিতে হবে। এরপর স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরের আঁঠালো অংশে পুরুষ ফুলের পুংকেশরটি আস্তে করে ২-৩ বার ছুঁয়ে পরাগরেণু লাগিয়ে দিতে হয়। এভাবে একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৫-৬ টি স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করতে হবে। বীজ বপনের পর ১০০ থেকে ১২৫ দিন পর ফল সংগ্রহ করা যাবে।

চালকুমড়া

উঁচু বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ উপযোগী মাটি। স্থানীয় জাতের চাষ করা যাবে । চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ৫ গ্রাম। প্রতি মাদায় ৫ টি বীজ বপন করে গজানোর পর ৩ টি সুস্থ চারা রাখতে হবে। মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ৪০০ সেন্টিমিটার। মাদায় সার প্রয়োগের ১০ দিন পরে বীজ বপন করতে হবে। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার দিতে হবে। এরপর শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম খৈল ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার নিয়ে সমান ভাগ করে প্রতিটি মাদায় দিতে হবে। চারা একটু বড় হলে ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪৫০ গ্রাম এমপি সার ১০-১৫ দিন অন্তর তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে চালকুমড়ার ফলন বৃদ্ধি করা যায়। চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পরে পুরুষ ফুল ও ৬০-৬৫ দিন পরে স্ত্রী ফুল ফুটে। বিকেলের দিকে সদ্য ফোটা ফুল উম্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তুলে পাঁপড়িগুলো ছিড়ে নিতে হবে। এরপর স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরের আঁঠালো অংশে পুরুষ ফুলের পুংকেশরটি আস্তে করে ২-৩ বার ছুঁয়ে পরাগরেণু লাগিয়ে দিতে হয়। এভাবে একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৫-৬ টি স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করতে হবে। তরকারী হিসেবে কচি অবস্থায় চালকুমড়া সংগ্রহ করা যাবে। সংরক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ পাকার পর চালকুমড়ার গায়ে মোমের মত সাদা স্তর পড়ার পর সংগ্রহ করতে হবে।

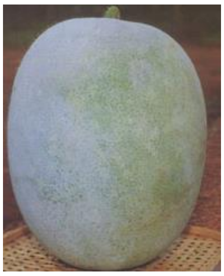

লাউ

সব ধরনের মাটি উপযোগী। তবে দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ হলে ভালো । পানিতে ভাসমান কচুরিপানার স্তুপের উপর মাটি দিয়ে বীজ বপন করে লাউ এর চাষ করা যায়। স্থানীয় জাত চাষ করা যায়। বারি লাউ -১ ভালো জাত। গ্রীষ্ম মৌসুমসহ সারা বছর এ জাতের চাষ করা যায়। এ জাতের লাউ গাছের পাতা অধিক সবুজ ও নরম। শীতকালীন ফসলের জন্য ভাদ্রের প্রথম থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। প্রতি শতক জমিতে ৫ গ্রাম বীজের প্রয়োজন। ২০০ সেন্টিমিটার দূরত্বে মাদা তৈরী করে প্রতি মাদায় সার প্রয়োগের ১০ দিন পরে ৫ টি বীজ বপন করতে হবে। বীজ গজানোর পর ৩ টি সুস্থ চারা রাখতে হবে। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার দিতে হবে। এরপর শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম খৈল ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার নিয়ে সমান ভাগ করে প্রতিটি মাদায় দিতে হবে। চারা গজানোর পরে ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪৫০ গ্রাম এমপি সার ১০-১৫ দিন অন্তর তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাচা বা বাউনি করে দিলে গাছের বিস্তারে সহায়ক হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে লাউয়ের ফলন বৃদ্ধি করা যায়। চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পরে পুরুষ ফুল ও ৬০-৬৫ দিন পরে স্ত্রী ফুল ফুটে। বিকেলের দিকে সদ্য ফোটা ফুল উম্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তুলে পাঁপড়িগুলো ছিড়ে নিতে হবে। এরপর স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরের আঁঠালো অংশে পুরুষ ফুলের পুংকেশরটি আস্তে করে ২-৩ বার ছুঁয়ে পরাগরেণু লাগিয়ে দিতে হয়। এভাবে একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৫-৬ টি স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করা যাবে। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিন পরে লাউ সংগ্রহ শুরু করা যায়।

শসা

দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। স্থানীয় লতানো ও ঝোপালে জাতের চাষ করা যেতে পারে। লতানো জাতের শসা লম্বাটে ও ঝোপালে জাতের শসা বা খিরা গোলাকার। মাঘ মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত শসার বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ৩ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার দিতে হবে। জমি তৈরী হলে ২০০ সেন্টিমিটার দূরত্বে মাদা করতে হবে। শতক প্রতি

২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম খৈল ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার নিয়ে সমান ভাগ করে প্রতিটি মাদায় দিতে হবে। সার প্রয়োগের ১০ দিন পরে মাদায় ৫ টি বীজ বপন করতে হবে। বীজ গজানোর পর ৩ টি সুস্থ চারা রাখতে হবে। চারা গজানোর পরে ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪৫০ গ্রাম এমপি সার ১০-১৫ দিন অন্তর তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাচা বা বাউনি করে দিলে গাছের বিস্তারে সহায়ক হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। বপনের ৪৫ দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শসা সংগ্রহ শুরু করা যাবে।

চিচিংগা

বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ উপযোগী মাটি। যে কোন জাত চাষ করা যাবে । ফাল্গুন থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বীজ বপন বা চারা রোপন করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা মাদা করে বপন করলে ২০ গ্রাম। আর জোড়া সারি করে বপন করলে ১৫ গ্রাম। মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ৩০০ সেন্টিমিটার। প্রতি মাদায় ৫ টি বীজ বপন করতে হবে। বীজ গজানোর পর প্রতি মাদায় ৩ টি সুস্থ চারা রাখতে হবে। জোড়া সারিতে বপন করলে সারির মধ্যকার দূরত্ব হবে ১০০ সেন্টিমিটার। প্রতি সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৬০ সেন্টিমিটার। সার প্রয়োগের ১০ দিন পরে বীজ বপন করতে হবে। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার দিতে হবে। এরপর শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম খৈল ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার নিয়ে সমান ভাগ করে প্রতিটি মাদায় দিতে হবে। চারা গজানোর পরে ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪৫০ গ্রাম এমপি সার ১০-১৫ দিন অন্তর তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাচা বা বাউনি করে দিলে গাছের বিস্তারে সহায়ক হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে।

ঝিংগা

বেলে দোআঁশ সবচেয়ে উপযোগী মাটি। ভূয়ে বা বর্ষাতি জাতের ঝিংগার চাষ হয়ে থাকে। ভূয়ে জাত মাঘ মাসের শেষ থেকে ফাল্গুন এবং বর্ষাতি জাত ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ১০ গ্রাম। মাদা বা জোড়া সারি করে বপন করতে হয়। মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ২০০ সেন্টিমিটার। জোড়া সারিতে বপন করলে সারির মধ্যকার দূরত্ব হবে ১০০ সেন্টিমিটার। শতক প্রতি ১০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি খৈল, ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৪০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। হালকা সেচ দিতে হবে। ঝিংগা গাছের জীবন কাল ৯০-১১০ দিন।

কাঁকরোল

সব ধরণের মাটিতে জন্মে। চৈত্র থেকে বৈশাখ মাসে কাঁকরোলের কন্দমূল বা কাটিং মাদায় রোপণ করতে হবে। দুইটি মাদার মধ্যে ২ মিটার দূরত্ব রাখতে হবে। মাদার গভীরতা হবে ৪৫ সেন্টিমিটার ও চওড়া হবে ৬০ সেন্টিমিটার। মাদা প্রতি ৩ টি কন্দমূল রোপণ করতে হবে। কাঁকরোলে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে হয়। এ জন্য ঠিক মত ফল পেতে হলে প্রতি ২০ গাছের মধ্যে ১ টি গাছে পুরুষ ফুল ধরতে হবে। মাদার উপরে মাচা বাউনি করে দেয়া ভালো। রোপণের ৬০ থেকে ৮০ দিন পরে ফল ধরা শুরু হয়।

শিম

বেলে দোআঁশ, দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। নলডক, কার্তিকা, ঘৃতকাঞ্চন, পুশা আরলী ও প্রলিফিক ও বারি শিম-১ ও ২ উল্ল্যেখযোগ্য জাত। আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত মাদা করে বীজ বপন করতে হবে। প্রতি মাদায় ১০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম খৈল ও ১০০ গ্রাম টিএসপি দিতে

হবে। মাদা প্রতি ৫ টি বীজ বপন করতে হবে। বীজ গজানোর পর প্রতি মাদায় ৩ টি সুস্থ চারা রাখতে হবে। চারা গজানোর ১৫ দিন পর ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। পুনরায় ১৫ দিন পরে ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। প্রয়োজনে হালকা সেচ দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় পানি না জমে। বপনের ১২০-২২০ দিন পর্যন্ত শিম তোলা যাবে।

বরবটি

সব ধরনের রস যুক্ত ঝুরঝুরে মাটি বরবটি াাবাদের জন্য উপযোগী মাটি। ফেলন ও তাইওয়ান থেকে আমদানীকৃত জাতের চাষ হয়ে থাকে। চৈত্র থেকে আষাঢ় অথবা শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ১১৫ গ্রাম। বপন দূরত্ব সারি থেকে সারি ২০০ সেন্টিমিটার ও বীজ থেকে বীজ ৩০ সেন্টিমিটার। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৩৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৯০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। চারা বড় হলে বাউনি দিলে গাছ বিস্তারে সহায়ক হবে। তবে ফেলন জাত খাটো হওয়ায় বাউনির প্রয়োজন হয় না। মাটিতে রসের অভাব হলে হালকা সেচ দিতে হবে।

মটরশুটি

সবরকমের দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। আলাস্কা ও বারি মটরশুটি-১ জাতের চাষ হয়ে থাকে। ভাদ্র থেকে পৌষ মাসে বীজ বপন করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ২০০ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ১০০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৬০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। ৭০ সেন্টিমিটার দূরত্বে পরপর দুটি জুলি বা নালা করে বীজ বপন করতে হবে। দুটি জুলির মধ্যে ৩০ সেন্টিমিটার দুরত্ব থাকবে। প্রতিটি জুলির গভীরতা হবে ৭ সেন্টিমিটার। জুলির মধ্যে ১৫ সেন্টিমিটার দুত্বে বীজ বপন করতে হবে। জুলি না করেও সারিতেও ১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে বীজ বপন করা যায়। দুটি সারির মধ্যে দূরত্ব হবে ৭০ সেন্টিমিটার। চারা বড় হলে জুলির দুই পাশ থেকে মাটি তুলে গোড়ায় দিতে হবে। সারের পাশে ২ মিটার উঁচু বাঁশের কঞ্চি বা পাটের খড়ি পুঁতে দিলে সহজে লতা বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজনমত হালকা সেচ দিতে হবে। ৯০-১১০ দিনে ফসল সংগ্রহ করা যাবে।

মিষ্টি আলু

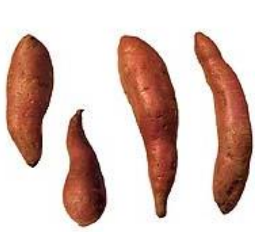

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ উপযোগী মাটি। তৃপ্তি, কমলা সুন্দরি, দৌলতপুরি, বারি মিষ্টি আলু ৪ ও ৫ জাতের চাষ হয়ে থাকে। কার্তিক মাসে লতা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে ২৫০ টি লতা বা কাটিং এর প্রয়োজন হবে। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে । রোপণ দূরত্ব হবে সারি থেকে সারি ৬০ সেন্টিমিটার ও লতা থেকে লতা ৩০ সেন্টিমিটার। লতা তেরচা বা বাঁকা করে রোপণ করতে হবে। রোপণের সময় কমপক্ষে ২ টি গিট বা আইক মাটির নিচে রাখতে হবে। বাড়তে শুরু করলে সারি বরাবর সামান্য উঁচু মাটির আইল করে দিতে হবে। লতা রোপণের ৬০ দিন পরে শতক প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০০ গ্রাম এমপি সার সারির দুই পাশে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে হালকা সেচ দিতে হবে। ১২৫ থেকে ১৫০ দিনে মিষ্টি আলু সংগ্রহ করা যাবে।

আলু

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ উপযোগী মাটি। হীরা, আইলসা, ডায়মন্ট, কার্ডিনাল, চমক, ধীরা, বিনেলা বারি টিপিএস ১ ও ২ জাতের চাষ হয়ে থাকে। কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ৬ কেজি। রোপণ দূরত্ব হবে সারি থেকে সারি ৫০ সেন্টিমিটার ও বীজ থেকে বীজ ২০ সেন্টিমিটার। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০০ গ্রাম টিএসপি, ১ কেজি এমপি, ৪০০ গ্রাম জিপসাম, ৩০ গ্রাম জিংক সালফেট ও ২০ গ্রাম বরিক এসিড দিতে হবে। মাটি অম্লীয় হলে ৩০০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিতে হবে। বপনের ৪০ দির পরে শতক প্রতি ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া গাছের গোড়ায় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বপনের ২০-২৫ দিন পরে স্টোলন বের হওয়ার সময় প্রথম সেচ, ৪০-৪৫ দিন পর গুটি বের হওয়ার সময় দ্বিতীয় সেচ, ৬০-৬৫ দিন পর গুটি বৃদ্ধি পাওয়ার সময় তৃতীয় বার সেচ দিতে হবে। এর পর মাটি শুষ্ক হলে ৮-১০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। বপনের ৯০-১২০ দিনে আলু সংগ্রহ করা যাবে।

মুলা

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ উপযোগী মাটি। তাসাকিসান, পিংকি, দ্রুতি জাতের চাষ হয়ে থাকে। আশ্বিন থেকে কার্তিক মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ১০০ গ্রাম। জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৩৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১ কেজি টিএসপি ও ৩০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। রোপণ দূরত্ব হবে সারি থেকে সারি ১৫ সেন্টিমিটার ও বীজ থেকে বীজ ১০ সেন্টিমিটার। তবে ছিটিয়েও বপন করা যাবে। বপনের ৭ দিন পরে ২৫ সেন্টিমিটার অন্তর ভালো চারা রেখে বাকীগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে। মুলার গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের জন্য প্রতি শতকে ৪০ গ্রাম বরিক এসিড বা বোরাক্স প্রয়োগ করতে হবে। বপনের ২১ দিন পর শতক প্রতি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১৫০ গ্রাম এমপি সার গাছের গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বপনের ৩৫ দিন পর শতক প্রতি ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১৫০ গ্রাম এমপি সার পুনরায় গাছের গোড়ার দিতে হবে। প্রয়োজনে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার হালকা সেচ দিতে হবে। বপনের ৬০ থেকে ৭৫ দিন পরে মুলা সংগ্রহ করা যাবে।

গাজর

দোআঁশ উপযোগী মাটি। পুশা কেশর, রয়েল ক্রস, কোরেল ক্রস জাতের চাষ হয়ে থাকে। আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ১০ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। সারি থেকে সারি ৩০ সেন্টিমিটার ও বীজ থেকে বীজ ৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে বীজ বপন করতে হবে। চারা গজানোর পর ১০ সেন্টিমিটার অন্তর ভালো চারা রেখে বাকীগুলে উঠিয়ে ফেলতে হবে। চারা গজানোর পর শতক প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৩০০ গ্রাম এমপি সার সমান দুই কিস্তিতে সারির দুই পাশের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। বপনের ৯০ থেকে ১২০ দিনে মধ্যে গাজর তোলা যাবে।

বাঁধা কপি

সব ধরনের মাটিতে চাষ করা যায়। দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটি হলে ভালো। কে-কে ক্রস, কে-ওয়াই ক্রস, প্রভাতি, অগ্রদূত জাতের চাষ হয়ে থাকে। ভাদ্র মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যাবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ২ গ্রাম। বীজ তলায় চারা বপনের ৩০ দিন পর চারা রোপণ করা যায়। জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি টিএসপি ও ৩০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। জমির উপরে মাটি ২০ সেন্টিমিটার উঁচু করে বেড তৈরী করে নেয়া ভালো। দুইটি বেডের মধ্যে দূরত্ব থাকবে ৩০ সেন্টিমিটার। বেডের উপরে ৬০ সেন্টিমিটার অন্তর সারি করে ও ৪৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে। শতক প্রতি ১২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৭০০ গ্রাম এমপি সার সমান তিন কিস্তিতে রোপণের ১০ দিন, ১৫ দিন ও মাথা বাঁধার সময় দিতে হবে। প্রয়োজনে ২-৩ বার হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের ১০০ থেকে ১২০ দিন পর বাঁধা কপি সংগ্রহ করা যাবে।

ফুলকপি

দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। রুস্পা, স্নো পিক, স্নো কিং, স্নোবল স্নো কুইন, মাঘী বেনারসি, পৌষালী জাতের চাষ হয়ে থাকে। ভ্রাদ্র থেকে কার্তিক মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ২ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৬০০ গ্রাম টিএসপি ও ৩৫০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। রোপণ দূরত্ব সারি থেকে সারি ৬০ সেন্টিমিটার ও চারা থেকে চারা ৪০ সেন্টিমিটার। রোপণের সময় চারার বয়স হবে ৩০ দিন। শতক প্রতি ১ কেজি ইউরিয়া ও ৩৫০ গ্রাম এমপি সার সমান তিন কিস্তিতে রোপণের ১০, ৩০ ও ৫০ দিন পর দিতে হবে। পানি সেচ দিতে হবে ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। রং ধবধবে সাদা রাখার জন্য গাছের চারিদিকের পাতা দিয়ে কচি অবস্থা থেকে ফুলকপি বেঁধে দিতে হয়। যাতে করে সূর্যের আলোয় রং হলুদ না হয়ে যায়। চারা রোপণের ৯০ থেকে ১২০ দিনে ফুলকপি সংগ্রহ করা যায়।

চায়না কপি

দোআঁশ উপযোগী মাটি। গ্রীন ডিউক, গ্রীন কমেট, গ্রীন চার্জার, ডিসিকো জাতের চাষ হয়ে থাকে। ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ১ গ্রাম। রোপণ দূরত্ব সারি থেকে সারি ৬০ সেন্টিমিটার ও চারা থেকে চারা ৩০ সেন্টিমিটার। সরাসরি বীজ বপন করেও চাষ করা যায়। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৩০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি টিএসপি ও ৩০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। শতক প্রতি ১ কেজি ইউরিয়া ও ৫০০ গ্রাম এমপি সার সমান দুই কিস্তিতে রোপণের ১৫ দিন ও মাথা বাঁধার সময় দিতে হবে। প্রয়োজনে ২-৩ বার হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের ৬০ থেকে ৯০ দিন পর চায়না কপি সংগ্রহ করা যাবে।

ব্রোকলি

দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। গ্রীন ডিউক, গ্রীন কমেট, গ্রীন চার্জার, ডিসিকো জাতের চাষ হয়ে থাকে। ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ২ গ্রাম। প্রতি ১০ টি মাদায় ১ গ্রাম। রোপণ দূরত্ব সারি থেকে সারি ৬০ সেন্টিমিটার ও চারা থেকে চারা ৫০ সেন্টিমিটার।

জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৫০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ৩০০ গ্রাম টিএসপি সার দিতে হবে। চারা রোপণের ৭ দিন পূর্বে পুনরায় শতক প্রতি ৫০

কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ৩০০ গ্রাম টিএসপি সার সমান ভাবে প্রতিটি মাদার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপণের ১৫ ও ৩০ দিন পর দুই কিস্তিতে ১ কেচি ইউরিয়া ও ৬০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের ৮০ থেকে ১০০ দিন পরে ব্রোকলি সংগ্রহ করা যাবে।

ওলকপি

বেলে দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। হোয়াইট ভিয়েনা, পারপেল ভিয়েনা জাতের চাষ হয়ে থাকে। আশ্বিন-অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ৩ গ্রাম। রোপণ দূরত্ব সারি থেকে সারি ৬০ সেন্টিমিটার ও বীজ থেকে বীজ ৩০ সেন্টিমিটার। শতক প্রতি ৮০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০০ গ্রাম টিএসপি ও ৭০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের ৯০-১০০ দিনে ওলকপি সংগ্রহ করা যাবে।

ধনিয়া

দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। বারি ধনিয়া-১ বা স্থানীয় জাতের চাষ হয়ে থাকে। আশ্বিন থেকে কার্তিক মাসে বীজ বপন করতে হবে। ছিটিয়ে অথবা সারিতে বপন করা যায়। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা সারিতে বপন করলে ৪০ গ্রাম আর ছিটিয়ে বপন করলে ৮০ গ্রাম। বীজ ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে বপন করতে হবে। জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ৫০০ গ্রাম টিএসপি সার দিতে হবে। বীজ লাগানের ১০ ও ৪০ দিন পর দুই কিস্তিতে শতক প্রতি ১ কেজি ইউরিয়া, ৪০০ গ্রাম টিএমসপি ও ২০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। হালকা সেচ দিতে হবে। বপনের ৩০-৪০ দিন পর থেকে পাতা সংগ্রহ শুরু করা যাবে এবং ১১০ থেকে ১২০ দিন পর ধনে সংগ্রহ করা যাবে।

পুদিনা পাতা

যে কোন ধরনের দোআঁশ মাটিতে চাষ করা যায়। বছরের যে কোন সময় পুদিনা গাছের শাখা সংগ্রহ করে রোপণ করা যায়। রোপণ দূরত্ব হবে ১৫ সেন্টিমিটার । শাখা সংগ্রহ করে সাথে সাথে রোপণ করা ভালো। কয়েক মাসের মধ্যে শাখা থেকে নতুন ডাল গজিয়ে বিস্তার লাভ করবে। জমি তৈরীর সময় প্রতি শতকে ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি খৈল, ৪০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০ গ্রাম টিএসপি ও ১৫ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। জমি তৈরীর ৭ দিন পর বপন বা রোপণ করা ভালো। বপনের ১৫ দিন পরে ৪০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১৫ গ্রাম এমপি দিতে হবে। রোপণের ২০-২৫ দিন পর থেকে ডগাসহ পাতা সংগ্রহ করা যাবে।

বীট

দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ উপযোগী মাটি। আরলি ওয়ান্ডার, ক্রসবীজ ইজিপসিয়ান ও ডেট্রয়েট ডার্করেড জাতের চাষ হয়ে থাকে। আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ২৫ গ্রাম। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। বপন দূরত্ব সারি থেকে সারি ২৫ সেন্টিমিটার ও বীজ থেকে বীজ ১৫ সেন্টিমিটার। একই স্থানে ৩ টি বীজ বপন করে চারা গজালে একটি রেখে বাকীগুলো তুলে দিতে হবে। চারা বড় হলে শতক প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০০ গ্রাম এমপি সার

সমান দুই কিস্তিতে গাছের গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের ৮০ থেকে ১০০ দিনে বীট সংগ্রহ করা যাবে।

শালগম

দোআঁশ উপযোগী মাটি। পার্পেল টপ, হোয়াইট গ্লোব, জাতের চাষ হয়ে থাকে। ভাদ্র থেকে কার্তিক মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ১০ গ্রাম। শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের ৬০-৮০ দিনে শালগম সংগ্রহ করা যাবে।

ধুন্দল

বেলে দোআঁশ সবচেয়ে উপযোগী মাটি। স্থানীয় জাতের চাষ হয়ে থাকে। ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ১০ গ্রাম। জোড়া সারিতে বপন করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০০ সেন্টিমিটার ও বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৫০ সেন্টিমিটার। মাদা করে বপন করা যায়। মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ২০০ সেন্টিমিটার। শতক প্রতি ১০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৪০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। বপনের ৯০-১০০ দিনে ধুন্দল সংগ্রহ করা যাবে।

পটল

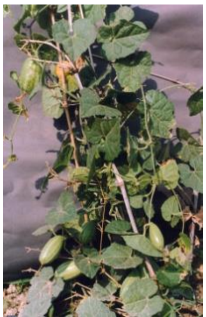

বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ উপযোগী মাটি। মুর্শিদাবাদি ও বালি (ডোরাকাটা) জাতের চাষ হয়ে থাকে। অগ্রহায়ণ-বৈশাখ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে ৪০ টি কাটিং (কন্দাল মূলসহ কান্ডের গোড়া অথবা শাখা কলম) লাগাতে হবে। রোপণ দূরত্ব সারি থেকে সারি ২০০ সেন্টিমিটার ও কাটিং থেকে কাটিং ৫০ সেন্টিমিটার । জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি দিতে হবে । মাদা তৈরী করে প্রতি মাদায় ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ গ্রাম খৈল ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার দিতে হবে। চারা গজানোর পর তিন কিস্তিতে শতক প্রতি ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪৫০ গ্রাম এমপি সার সমান ভাবে প্রতিটি মাদায় দিতে হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। পটল গাছের জীবন কাল ২ থেকে ৩ বছর। তবে প্রথম বছর ফলন বেশী হয়।

আদা

বেলে দোআঁশ উপযোগী মাটি। স্থানীয় জাতের চাষ হয়ে থাকে। চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ্য মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে ১০ কেজি কন্দ রোপণ করতে হবে। প্রতি কন্দের ওজন হবে ২০ থেকে ২৫ গ্রাম। রোপণ দূরত্ব সারি থেকে সারি ৫০ সেন্টিমিটার ও কন্দ থেকে কন্দ ২০ সেন্টিমিটার। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৪০

কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার ও ৩০০ গ্রাম টিএসপি দিতে হবে। এরপর চারা বড় হলে শতক প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৬০০ গ্রাম এমপি সার দুই কিস্তিতে সারির মধ্যবর্তি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপণের ২৮০ থেকে ৩০০ দিন পরে আদা সংগ্রহ করা যাবে।

রসুন

দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি উপযোগী। স্থানীয় জাতের চাষ হয়ে থাকে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে কোয়া বপন বা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে দেড় কেজি রসুনের কোয়া বপন করতে হবে। বপন দূরত্ব হবে সারি থেকে সারি ১৫ সেন্টিমিটার ও কোয়া থেকে কোয়া ১০ সেন্টিমিটার। জমি তৈরীর সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৬০০ গ্রাম টিএসপি ও ৩০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। চারা গজানোর ২০ দিন পর ৭০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৩০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিতে হবে। বপনের ৪ মাস পর রসুন সংগ্রহ করা যাবে।

পেঁয়াজ

দোআঁশ, বেলে দোআঁশ ও পলিযুক্ত মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উপযোগী। বারি পেঁয়াজ-১ বা স্থানীয় ফরিদপুরী ও তাহেরপুরী চাষ হয়ে থাকে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা চারা তৈরী করে ১৫ গ্রাম আর সরাসরি বীজ বপন করে ৩০ গ্রাম। রোপণ দূরত্ব সারি থেকে সারি ৩০ সেন্টিমিটার ও চারা বা বীজের মধ্যে ১৫ সেন্টিমিটার। শতক প্রতি ৪০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১ কেজি ইউরিয়া, ৮০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে শতক প্রতি ৪০০ গ্রাম জিপসাম, ১০০ গ্রাম জিংক সালফেট ও ৫০ গ্রাম বরিক এসিড বা বোরাক্স প্রয়োগ করতে হবে। ১০ দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হবে। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বপনের ১০০ থেকে ১৩০ দিন পর পেঁয়াজ সংগ্রহ করা যাবে।

মরিচ

দোআঁশ উপযোগী মাটি। স্থানীয় জাতের চাষ হয়ে থাকে। গ্রীষ্ম বা খরিপ মৌসুমে ও রবি মৌসুমে চাষ করা যায়। ভাদ্র থেকে আশ্বিন ও চৈত্র থেকে বৈশাখ মাসে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি শতক জমিতে বীজের চাহিদা ২৫ গ্রাম। মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত অথবা ভাদ্রের মাঝামাঝি হতে কার্তিক মাস

পর্য রোপণ করা যাবে। রোপণ দূরত্ব সারি থেকে সারি ৭০ সেন্টিমিটার ও চারা থেকে চারা ৬০ সেন্টিমিটার। শতক প্রতি ৬০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৮০০ গ্রাম টিএসপি ও ৬০০ গ্রাম এমপি সার দিতে হবে। হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের ১৪০ থেকে ১৬০ দিনে মরিচ সংগ্রহ শুরুকরা যাবে।

সেশন ৭ঃ প্রানিসম্পদ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যপারে উপ-প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন অপরিহার্য্য। উপ-প্রকল্প এলাকায় গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী উৎপাদনে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করে পরিবর্তনের জন্য নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি চিহ্নিত ও অনুমোদন করে নিম্নবর্ণিত ছকপ্রত্রে বর্ণনা করতে হবে।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

কার্যক্রম	বর্তমান	অনুমোদিত	কর্মসূচী
জাত			
কৃত্রিম প্রজনন			
টিকা			
চিকিৎসা			
হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ			
প্রাণিজাত খাদ্য (দুধ, ডিম, মাংশ) প্রক্রিযাজাত, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ			
অন্যান্য			

সেশন ৮ঃ হাসঁ-মুরগী ও গবাদিপশু উৎপাদন প্রযুক্তি

দেশী মুরগি পালন

পারিবারিক উপার্জন বৃদ্ধির জন্য **উন্নত** প্রযুক্তিতে দেশী মুরগি পালন ক্রমেই প্রসার লাভ করছে। দেশী মুরগির ডিম এবং ২ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত মুরগি পালনের পর বিক্রি করে বেশ লাভবান হওয়া যায়।

খামারঃ মোটামুটি ১০টির বেশি দেশী মুরগি ও ১টি বড় দেশি মোরগ সহ দেশী মুরগির খামার শুরু করা যেতে পারে। মোট মুরগির এক-তৃতীয়াংশ বাচ্চা ফুটানোর জন্য এবং অবশিষ্ট ডিম উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা ভালো।

মুরগির ঘরঃ পর্যাপ্ত াাৈলো বাতাসের ব্যবস্থা রেখে মুরগীর ঘর তেরি করতে হবে। ঘর সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মাসে একবার শুকনা চুন পরিমান মত ঘরে, খাঁচায় ছিটিয়ে দিতে হবে। মোরগ মুরগীর জন্য বালির গর্তে গোসলের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও দমনঃ শুরুতে মুরগিগুলো ও মোরগকে ক্রিমি নাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে এব রাণীক্ষেত রোগ প্রতিরোধে টিকা দিতে হবে। শরীরে উকুন দমন করতে হবে। আধা কেজি ছাই, ১ চা চামচ কেরোশিন তৈল এবং একটি কর্পুর (ন্যাপথালিন) গোটা ভেঙ্গে সবগুলো এক সাথে মিশিয়ে মাংসের মধ্যে লাগিয়ে দিলে লাল পোকা, উকুন মরে যায়। ওমের মুরগীর পোকা দমনের জন্য ওমের খরকুটু পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং পুনরায় নতুন একটি ওমের পাত্রে ডিম এবং মুরগী বসিয়ে দিতে হবে। তাহলে উকুন ও আঠালীর আক্রমন থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। যদি এতেও কোন ফল না হয় তাহলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই রোগের টিকা সবসময় হাসপাতালে পাওয়া যায়। ঘর, খাদ্য ও পানির পাত্র সব সময় পরিস্কার রাখতে হবে। ইঁদুর, আড়শোলা ইত্যাদির উপদ্রব বন্ধ করতে হবে। প্রতিদিন কিছু পরিমান আদা এবং রশুন সেই সাথে পানির পটে এক টেবিল চামুচ কালোজিরার তৈল মিশিয়ে মুরগিকে খাওয়ালে ঠান্ডা জনিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তুলসী পাতার রসও কার্যকর হতে পারে। আতা পাতা, হলুদ ব্যাক্টেরিয়া নাশক হিসাবে কাজ করে, সজনে পাতা ভিটামিন সি, ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসের উৎস এটি এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবেও কাজ করে।

খাদ্যঃ মুরগির খাদ্য চাহিদা তিন ভাগে বয়সের উপর নির্ভর করে। যেমন ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ষ্টার্টার মুরগি, ৬ সপ্তাহ পার হয়ে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাড়ন্ত মুরগি এবং ২০ সপ্তাহের অধিক লেয়ার বা ডিম পাড়া মুরগি। বাড়ীর আঙ্গিনায় ও আশেপাশে চরে খাওয়ার সাথে প্রতিটি মুরগিকে দিন প্রতি ৫০ থেকে ৬০ গ্রাম আলাদা ভাবে পুষ্টি সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে । যমন-

- শর্করা জাতীয়ঃ
  - দানাদার - ভুট্টা গম , যব, কাওন, চাউল।
  - আঁশ - চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, কাসাভা।
- আমিষ জাতীয়ঃ
  - প্রানীজ - শুটকি মাছ, মিট মিল, ফিদার মিল, লিভার মিল,প্রটিন কনসেনট্রেট।
  - উদ্ভিদ - সায়াবিন মিল, তিলখৈল , তৈল বীজের খৈল, তুলা বীজের খৈল, সবুজ শাকসব্জি।
- চর্বি জাতীয়ঃ প্রাণিজাত তৈল, হাঁস-মুরগরি তৈল, উদ্ভিদজাত তৈল, সার্কলিভার তৈল।
- ভিটমিন জাতীয়ঃ শাকসব্জি ও কৃত্রিম ভিটামিন।
- খনিজ জাতীয়ঃ ঝিনুক, ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন।
- পানি

পুষ্টি সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণঃ প্রতি **কেজি পুষ্টি সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য তৈরিতে** ৭৫০ গ্রাম চাউলের কুঁড়া/গমের ভূষি, হাতের ৩ মুঠ সয়াবিন বা মাসকলাই, ১ মুঠ শুঁটকি মাছের গুঁড়া, ১ মুঠ ডিমের খোসা/ঝিনুক চূর্ণ ও ১ চিমটি লবণের প্রয়োজন হবে। এই সাথে চাহিদা মত সবুজ ও রঙিন শাকসব্জি ও ফলমূল দিতে হবে।

বাচ্চা ফুটানোঃ মুরগি ডিম পাড়া শেষ হওয়ার পর উম আসলে ১৫ থেকে ১৬টি ডিম তা দিয়ে বাচ্চা ফুটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সাইজ বা আকার পরীক্ষা করে ভাল ডিমগুলো বাছাই করতে হবে। ডিমের বয়স গরম কালে এক সপ্তাহ এবং শীতকালে দুই সপ্তাহ হতে হবে। তা দেয়া মুরগীর নাগালের কাছাকাছি খাদ্য ও পানি সরবরাহ করতে হবে বা মজুত রাখতে হবে। ডিম তা দেয়া শুরুর ৫/৬ দিন পর ডিম ওলট পালট করে দিতে হবে। আর ৭/৮ দিন পর রাত্রে অন্ধকারে টর্চ বা মোমবাতির আলোতে পরীক্ষা করে ডিমের ভিতর বাচ্চা দেখা না গেলে সরিয়ে ফেলতে হবে। তা দেয়া মুরগি ডিম নাড়াচাড়া করে থাকে। যদি মুরগি একাজটি না করে তাহলে প্রতিটি ডিম দিনে কয়েকবার বার ওলট পালট করে দিতে হবে। এতে ডিমগুলো সমানভাবে তাপ পাবে। ডিম তা দেয়া শুরুর হওয়ার বাতাসের আর্দ্রতা অনুকুল থাকলে বাচ্চা ফুটার হার বেশী হয়। মোটামুটি ১৭/১৮ দিন পর্যন্ত বাতাসের আর্দ্রতা ৫৫% এবং ১৯ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত ৭০-৮০% প্রয়োজন হয়। বাতাসের আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র পাওয়া যায়। খুব গরম বা শীতের সময় আর্দ্রতা কম থাকতে পারে। এই সময় মুরগি ডিম তা দেয়া শুরু করলে বাতাসের আর্দ্রতা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকলে

পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা হালকা বা কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে। ভিজা কাপড়টি চিপিয়ে পানি বের করে দিতে হবে। এরপর ভিজা কাপড়টি দিয়ে ডিমগুলো একে একে মুছে দিতে হবে। এইভাবে প্রতিদিন দুই বার মুছে দেয়া ভালো। এতে ডিমে প্রয়োজনীয় বাতাসের আর্দ্রতা বজায় থাকতে সহায়ক হবে। মুছে দেয়া সম্ভব না হলে ভিজা কাপড়টি চাপ দিয়ে অবশিষ্ট পানি ডিমগুলোর উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে বাচ্চা ফুটার হার বৃদ্ধি হবে। ফোটার পর ৫/৬ ঘন্টা পর্যন্ত বাচ্চাগুলোকে উম দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে বাচ্চাগুলোর শরীর শুষ্ক হবে। গরম কালে ৫/৬দিন এবং শীত কালে ১০/১২ দিন পর্যন্ত বাচ্চার সাথে মা মুরগিকে থাকতে দিতে হবে, আলাদা করে প্রয়োজনীয় খাদ্য দিতে হবে এবং দ্রুত সুস্থ্য হওয়ার জন্য পানিতে ভিটামিন মিশিয়ে দিতে হবে। সময়মত মা মুরগি থেকে বাচ্চাগুলো পৃথক বা আলাদা করে দিয়ে কৃত্রিম ভাবে ব্রুডিং বা তাপ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বৈদ্যুতিক হিটার, বাল্ব, কেরোসিন বাতি, হ্যাজাক ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে তাপ দেয়া যায়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ১০০ ওয়াটের ২টি ও ৬০ ওয়াটের ১টি বাল্ব আর শীতকালে ২০০ ওয়াটের ২টি ও ১০০ ওয়াটের ১টি বাল্ব প্রতি ৫০০ বাচ্চার জন্য ব্রুডারে ব্যবহার করা যথেষ্ট। বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার ১০-১২ ঘন্টা পূর্ব থেকে ব্রুডার চালু করে প্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্টি করতে হবে।

বাচ্চার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ বাচ্চাগুলোকে আলাদা ভাবে খাবার দিতে হবে। ডিম থেকে বাচ্চা হওয়ার পর দুই লিটার সাইজের বোতল ভর্তি বিশুদ্ধ পানিতে ২৫ গ্রাম গ্লুকোজ, ১/২ গ্রাম ভিটামিন সি, ১/২ গ্রাম মাল্টি ভিটামিন গুলিয়ে খাওয়াতে হবে। পানি খাওয়ানোর মোটামুটি ৩ ঘন্টা পর খাবার দিতে হবে। যথাসময়ে টীকা দিতে হবে। পরিষ্কার পাত্রে সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। মাঝে মাঝে চরে খেতে দিতে হবে। চরে খাওয়ার সাথে অতিরিক্ত বা সম্পূরক **খাদ্য দিতে হবে। দশ সপ্তাহ বয়সে বাচ্চার জন্য সম্পুরক খাদ্যের পরিমান হবে দৈনিক ৩৫ গ্রাম।**

মা মুরগির পরিচর্য্যাঃ সাধারণত একটি দেশি মুরগি ডিম পাড়ার জন্য ২০/২৪ দিন এবং ডিম থেকে বাচ্চা হতে ২১ দিন সময় নেয়। সময়মত বাচ্চাগুলো থেকে পৃথক হওয়ার পর বাচ্চার ডাকাডাকি শুনতে না পেয়ে মা মুরগি খাদ্য ও পানি খেতে আগ্রহী হবে। চরে খাওয়ার পাশাপাশি দুই সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতি দিন ৮০-৯০ গ্রাম খাবার দিতে হবে। পরবর্তীতে দৈনিক ৫০-৬০ গ্রাম লেয়ার খাবার দিলে হবে। প্রতিটি মুরগিকে ৩/4 মাস পর পর কৃমির ঔষধ এবং 4/৫ মাস পর পর রানীক্ষেত রোগের টীকা দিতে হবে। পালনের পর বড় করে তুলতে তিন থেকে সাড়ে তিন মাস মেয়াদের প্রয়োজন হয়। সর্বসাকুল্যে দেশি মুরগি পালনে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বড় হওয়া পর্যন্ত চার থেকে সাড়ে চার মাস লাগে। তবে মা মুরগিকে বাচ্চা থেকে পৃথক করে দিলে দুই মাসের মধ্যে বড় করে তোলা যায়। মা মুরগি পুনরায় ডিম পাড়া শুরু করবে। ডিম পাড়ার জন্য বেশি সময় পাবে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসিইটউট (বিএলআরআই) কর্তৃক উন্নতকৃত দেশী মুরগীর জাতের বৈশিষ্ট্য

কমনদেশী মুরগী

হিলি মোরগ

গলাছিলা মুরগী

বৈশিষ্ট্য		কমনদেশী	হিলি	গলাছিলা
প্রথম ডিম পাড়ার সময় মুরগীর দৈহিক ওজন (গ্রাম)	:	১৩০০-১৪০০	১৫০০-১৬০০	১৩০০-১৪০০
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স (সপ্তাহ)	:	১৮-২০	১৯-২১	১৯-২১
বার্ষিক ডিম উৎপাদন (সংখ্যা)	:	১৭০-১৮০	১৫০-১৬০	১৭০-১৮০
প্রতি ডিমের গড় ওজন (গ্রাম) (৪০ সপ্তাহ)	:	৪৫-৪৭	৪৫-৪৭	৪৩-৪৫
উর্বর ডিম (%)	:	৯৪	৮৮	৮৮
বাচ্চা পরিস্ফুটনের হার (%) (মোট ডিমের ভিত্তিতে)	:	৮৪	৮০	৭০
খাদ্য প্রদান (গ্রাম/দিন/মুরগি)	:	৮০	৯০	৮০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মোরগ বাচ্চা (গ্রাম)	:	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	৬০০-৭০০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মুরগী বাচ্চা (গ্রাম)	:	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০	৫০০-৬০০
দৈহিক ওজন মোরগ (৪০ সপ্তাহ) (গ্রাম)	:	২০০০-২৫০০	২৫০০-৩০০০	২০০০-২৫০০
দৈহিক ওজন মুরগী (৪০ সপ্তাহ) (গ্রাম)	:	১৪০০-১৫০০	১৭০০-১৮০০	১৪০০-১৫০০

লেয়ার পালন

ভূমিকা

দারিদ্র্যবিমোচনে পশুসম্পদের ভূমিকা সকল মহলে সমাদৃত ও পরীক্ষিত। বর্তমানে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোগে পরিলক্ষিত হলেও অনেক উদ্যোক্তা আধুনিক প্রযুক্তি ও পুঁজির অভাবে ঝরে পড়েছে। যদিও বেসরকারি খামার স্থাপনে বাণিজ্যিক খামারিরা সরকারের নিকট থেকে আর্থিক সহযোগিতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের খামারিরা এ ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের দারিদ্র্যবিমোচন তথা আত্ম-কর্মসংস্থান ও পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি লাগসই যুগোপযোগী লেয়ার মডেল উদ্ভাবন করেছে।

এই মডেলের আওতায় একজন ক্ষুদ্র খামারি ২০০ টি লেয়ার মুরগি পালন করে তার পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা দৈনন্দিন সাংসারিক খরচাদি ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষাসহ যাবতীয় খরচ মিটিয়ে বৎসরে প্রায় ৮০০০ থেকে ৯০০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারবে। তাছাড়া, একজন খামারি তার নিজস্ব পারিবারিক শ্রমকে সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মে নিয়োজিত থেকে এ দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাই, আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যবিমোচন এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণসহ জাতীয় অর্থনীতিতে লেয়ার মডেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

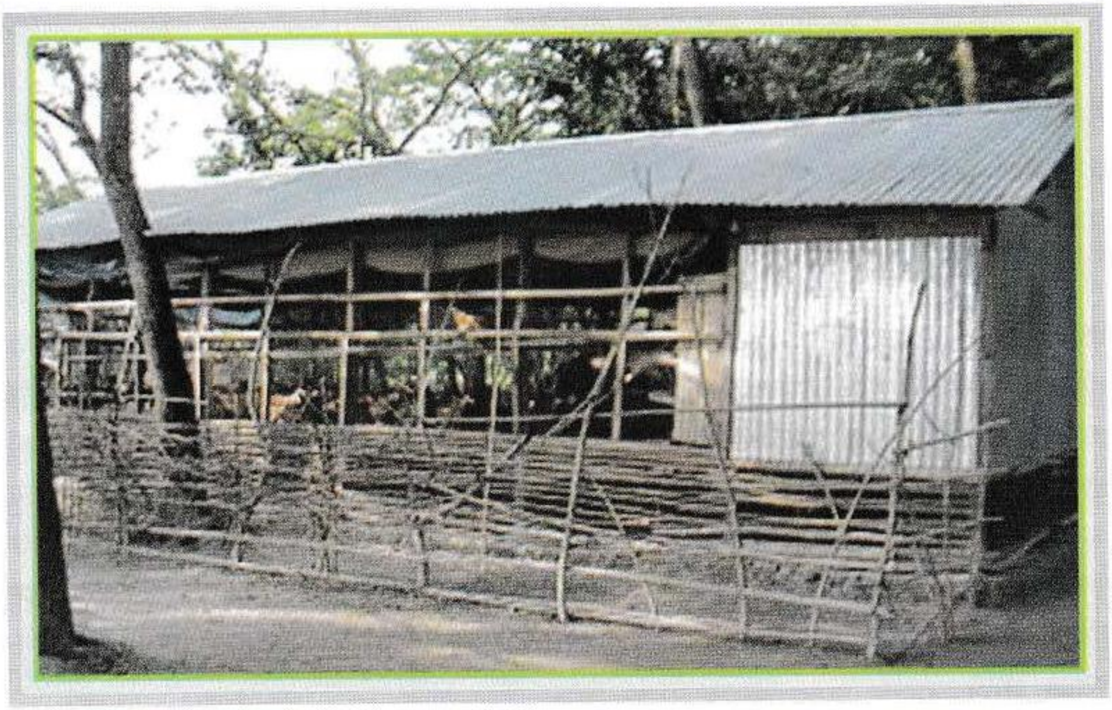

মডেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

লেয়ার পালন মডেলটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত অংগ (Component) গুলি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে হবে ঃ

১. সঠিকভাবে সুফলভোগী/খামারি নির্বাচন,

২. খামারি সংগঠন তৈরি,

৩. পারিবারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ,

৪. খামারের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে নির্ধারিত ডিজাইনে বায়োসিকিউরিটি রক্ষা মূলক মুরগির ঘর তৈরি,

৫. বাচ্চার উপযুক্ত ব্রুডিং,

৬. মুরগির সঠিক জাত বা স্ট্রেইন নির্বাচন,

৭. গুণগত মান সম্পন্ন সুষম খাদ্য তৈরি এবং সঠিকভাবে ব্যবহার,

৮. উপকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা,

৯. সংগঠনের মাধ্যমে সকল উপকরণ ক্রয় এবং খামারের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করা,

১০. নিয়মিতভাবে সদস্যদের মতবিনিময় সভা করা,

১১. সংগঠনের সদস্যদের জন্য আপদকালীন আর্থিক সংস্থান রাখার ব্যবস্থা করা।

মডেল বাস্তবায়ন কৌশল

খামারি নির্বাচন ও সংগঠিতকরণ

বাংলাদেশের যে কোনো এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ১০-১২ জন উৎসাহী/আগ্রহী, স্বল্প শিক্ষিত, পরিশ্রমী ও সৎ মহিলা/পুরুষ বা বেকার যুবককে খামারি হিসেবে নির্বাচন করত তাদেরকে সংগঠিত করা হয়। তবে নির্বাচিত খামারিদের যাতে লেয়ার খামার স্থাপনের জন্য নিজস্ব জমি থাকে এবং সেই স্থানটি লেয়ার পালনের জন্য অবশ্যই যথোপযোগী হতে হবে। নির্ধারিত খামারিদের সংগঠনের আওতায় আনলে খামারিরা দলগতভাবে খাদ্য, টিকা ও খাদ্য মিশ্রিত করণ প্রভৃতি কাজ মিলেমিশে করতে পারে। তাছাড়া, দলগতভাবে কাজ করলে খামরিরা তাদের খামারের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে একে অপরের সাথে মতবিনিময়ের ফলে নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে।

নির্বাচিত খামারির পারিবারিক প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত খামারিকে লেয়ার পালনের ওপর এক সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এই প্রশিক্ষণে লেয়ার পালনের তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ যেমন, ঘর তৈরি, লেয়ার বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা, সুষম রেশন ফরমুলেশন, টিকাদান কর্মসূচি, খাদ্য সংরক্ষণ, লেয়ারের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার, বায়োসিকিউরিটি, আলোক ব্যবস্থাপনা, জীবাণুনাশকের ব্যবহারের গুরুত্ব, রেকর্ড সংরক্ষণের গুরুত্ব, বাজারজাতকরণ এবং খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাবের পাশাপাশি সকল বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে একজন নতুন খামারি "হাতে করে শিখে" বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবারের দুইজন সদস্যকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। খামারের সকল প্রয়োজনে পারিবারিক সহযোগিতা নিশ্চিত হবে।

ফলোআপ প্রশিক্ষণ

দুই এক ব্যাচ মুরগি পালনের পর সমস্যাভিত্তিক ফলোআপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।

খামারের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে নির্ধারিত ডিজাইনে মুরগির বায়োসিকিউরিটি রক্ষামূলক ঘর তৈরি ঃ

খামারের স্থান নির্বাচন

তত্ত্বীয়ভাবে পোল্ট্রি খামারের জন্য যে সমস্ত শর্ত পালন করে স্থান নির্বাচন করার কথা তা পুরোপুরি সম্ভব না হলেও নিম্নলিখিত শর্ত পালনপূর্বক স্থান নির্বাচন করা দরকার। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্তসমূহ পালন করা দরকার তা নিম্নরূপঃ

১. উঁচু এবং ভালো নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ আবাসিক আবাসন হতে একটু দূরে হওয়া ভাল,

২. আশপাশে খামার থাকলে তা নিরাপদ দূরত্বে থাকা বাঞ্ছনীয়,

৩. লিটার সরিয়ে ফেলার ভালো ব্যবস্থা /সুযোগ থাকা প্রয়োজন,

৪. আশপাশে পঁচা ডোবা ও নর্দমামুক্ত হতে হবে,

৫. যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে,

৬. বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকতে হবে,

৭. খামার পরিচালনার জন্য পরিবারের সদস্যদের যথেষ্ট আগ্রহ থাকতে হবে,

৮. বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে।

বাসস্থান নির্মাণ

ডিমপাড়া মুরগি পালনের ক্ষেত্রে খামারের আকার অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়। একজন ক্ষুদ্র খামারির জন্য ২০০ টি মুরগি পালন উপযোগী ঘরের নক্‌শা এবং নির্মাণ নিম্নে দেয়া হলো। ২০০ টি মুরগি পালনের জন্য সার্ভিস এরিয়াসহ (৫+২৫) X ১২ বর্গফুট জায়গাই যথেষ্ট। এতে প্রতিটি মুরগির জন্য প্রায় ১.৫২ বর্গফুট জায়গা দেয়া হয়েছে। ঘরটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করতে না পারে এবং বায়ু এক পাশ থেকে প্রবেশ করে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। এতে বিশদ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এ্যামোনিয়াসহ অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস বিতারিত হয়ে মুরগির জন্য আরামদায়ক পরিবেশের সৃষ্টি করবে এবং যা লিটার শুষ্ক রাখতে সাহায্য করবে।

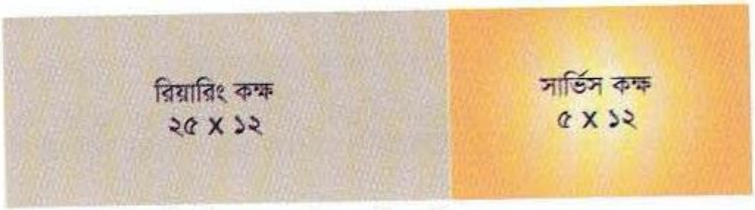

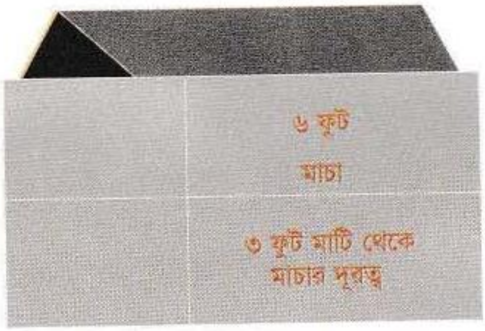

ঘরের বর্ণনা

মেঝে

মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালনের জন্য ঘরের নক্‌শা উপরে দেয়া হয়েছে । এলাকাভিত্তিক প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে বাঁশের অথবা সুপারি গাছের ফালি দিয়ে মাচা তৈরি করা যায়। মুরগির বিষ্ঠা ভালোভাবে নিচে পড়ে যাওয়ার জন্য এক ফালি থেকে অন্য ফালির দূরুত্ব ১ ইঞ্চি রাখা হয়েছে। প্রতিটি ঘরে ৬০ বর্গফুটের একটি সার্ভিস এরিয়া রাখা হয়েছে, যা খাদ্য, ঔষধ পত্র এবং অন্যান্য পোল্ট্রী উপকরণ রাখতে সাহায্য করবে। মাচা ভূমি থেকে সাড়ে তিন ফুট উচুঁতে করা হয়েছে যাতে লিটার পরিষ্কারে সুবিধা হয় এবং লিটার সব সময় শুকনা থাকে।

পাশের বেড়া

সার্ভিস এরিয়া ছাড়া অন্য দিকের বেড়াগুলো বাঁশের চটা দিয়ে ১ বর্গ ইঞ্চি তার জালি তৈরি করা

যায় যাতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে। তবে বাঁশের পরিবর্তে বাজারে যে গ্যালভানাইজড্ তারের তারজালি পাওয়া যায় তাও ব্যবহার করা যায়।

চালা

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সামগ্রী উপকরণ যেমন- ছন, গোলপাতা, বাশের চাটাই প্রভৃতি দিয়েই ঘরের চালা তৈরি করা যায়। তবে ছন এবং গোলপাতা দিয়ে তৈরি চালা পোল্ট্রি পালনের জন্য বিশেষ উপযোগী বলে গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে । তাছাড়া অপেক্ষাকৃত সস্তা ঢেউটিন, পলিথিন প্রভৃতি চালা তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে টিন দিয়ে চালা তৈরি করলে অবশ্যই টিনের নিচে তাপ নিরোধক যেমন বাঁশের চাটাই ব্যবহার করতে হবে।

ঘর জীবাণুমুক্তকরণ

সঠিক স্বাস্থ্যবিধি পালন লাভজনক মুরগির খামারের পূর্বশর্ত। তাই ঘর তৈরির পর প্রথম কাজ হচ্ছে ঘর জিবাণুমুক্তকরণ। প্রথমে ঝাড়ু এবং পরে ব্রাশ দিয়ে ঘসে ধুলাবালি ও ময়লা পরিষ্কার করার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে সম্পূর্ণ ঘর ধুয়ে দিতে হবে। অতপর জীবাণুনাশক দিয়ে সম্পূর্ণ ঘর ভিজিয়ে ১ দিন রেখে দিতে হবে। স্থানীয়ভাবে বাজারে অনেক জীবাণুনাশক পাওয়া গেলেও ক্লোরেক্স নামক তরল জীবাণুনাশক ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া গেছে। উৎপাদনকারী ব্যবহারবিধি অনুসারে মিশ্রণ অনুপাতে ১০ লিটার পানির সাথে এবং ৪০ মিঃলি ক্লোরেক্স মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। নতুবা বাচ্চা অতি সহজেই রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। ঘরে বাচ্চা সরবরাহের কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। প্রথম দিন ঝাড়ু ও পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং দ্বিতীয় দিন ঝাড়ু, ব্রাশ ও পানি দিয়ে পরিষ্কার, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন সকালে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং সবশেষে পরিষ্কার পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলতে হবে।

বাচ্চা উঠানোর আগে মুরগির ঘর তৈরিকরণ

ধাপসমূহ

১. পরিষ্কার পানি দিয়ে মুরগির ঘর স্প্রে করে পরিষ্কার করা।

২. পানির সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবাণুনাশক মিশিয়ে মুরগির ঘর স্প্রের মাধ্যমে জীবাণুনাশকরণ। (ক্লেরক্স-৪০মি.লি./১০ লিটার পানি)।

৩. এয়ার টাইড ঘরের ক্ষেত্রে ধূমায়িতকরণের মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরণ ভালো।

৪. মুরগির ঘরে ক্যানপি এবং চিকগার্ড লাগানো।

৫. ঘরের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরীক্ষাকরণ।

৬. খাবারের পাত্র এবং পানির পাত্র জীবাণুমুক্ত করা।

৭. ঘরে মুরগির বাচ্চা উঠানো।

বাচ্চার উপযুক্ত ব্রুডিং

প্রচলিত বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে অথবা বিএলআরআই কতৃক উদ্ভাবিত বাঁশের তৈরি চিক ব্রুডার ব্যবহার করেও ব্রুডিং করা যায়। যদি বিএলআরআই কতৃক উদ্ভাবিত চিক ব্রুডারের নির্মাণ ব্যয় একটু বেশি তথাপিও এর কার্যকারিতা অন্যান্য ব্রুডারের চেয়ে অনেক ভালো। ব্রুডিংকালীন সময়ে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণরাখা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। যে পদ্ধতিতেই ব্রুডিং করা হোক না কেন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সঠিক রাখতে হবে তা না হলে বাচ্চার সঠিক বৃদ্ধি সম্ভব হবে না। ঋতুভেদে ব্রুডিং সময়কাল পরিবর্তন হতে পারে যেমন, গ্রীষ্মকালে ২-৩ সপ্তাহ আবার শীতকালে ৩-৪ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হতে পারে। ব্রুডিং-এর সময় যে তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে তা নিম্নে দেয়া হলো।

সপ্তাহ	তাপমাত্রা
১ম	৯৫° সে ঃ
২য়	৯০° সে ঃ
৩য়	৮৫° সে ঃ
৪র্থ	৮০° সে ঃ
৫ম	৭৫° সে ঃ
৬ষ্ঠ	৭০° সে ঃ

প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্রুডিং-এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চিকগার্ড স্থাপন। সাধারণত ২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চিকগার্ড হোভার থেকে ২.০- ২.৫ ফুট দূরে স্থাপন হরা হয়। চিকগার্ড হিসেবে হার্ডবোড, বাঁশের চাটাই ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। তবে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বাঁশের চাটাই অথবা ফ্রেমের মধ্যে পাতলা চট দিয়েও চিকগার্ড বানানো যায়। অবস্থা এবং সহজ লভ্যতার ওপর ভিত্তি করে চিকগার্ড বানাতে হবে এবং তা স্থাপনের পূর্বে, পূর্বের নিয়মে যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

ব্রুডিং করার সময় ব্রুডারের ভেতরের বাচ্চার অবস্থা দেখে বুঝতে হবে তাপমাত্রা সঠিক আছে কি না? এ জন্য নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সাধারণত ব্রুডারের ভেতর বাচ্চার অবস্থান তিনটি অবস্থায় বিরাজ করতে পারে।

আরামদায়ক অবস্থা

বাচ্চা ব্রুডারের ভেতর ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় থাকবে ।

বাচ্চার অবস্থান, আরামদায়ক অবস্থা বিদ্যমান ।

অতিরিক্ত গরম

এ অবস্থায় বাচ্চা ব্রুডারের ভেতর চিকগার্ডের গায়ের দিকে সরে থাকবে অর্থাৎ চিকগার্ড ঘেঁষে অবস্থান করবে ।

বাচ্চার অবস্থান, অতিরিক্ত গরম অবস্থা ।

অতিরিক্ত ঠান্ডা ঃ এ অবস্থায় বাচ্চাগুলো হোভারের খুব কাছাকাছি চলে এসে গাদাগাদি করবে ।

বাচ্চার অবস্থান, অতিরিক্ত ঠান্ডা অবস্থা ।

প্রতিকার

অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডায় তাপের উৎসের তাপমাত্রা যথাক্রমে কমিয়ে বা বাড়িয়ে সঠিক তাপমাত্রা সমন্বয় করতে হবে।

বাচ্চার প্রথম খাদ্য

লেয়ার বাচ্চা খামারে পৌঁছানোর পর পরই প্রথম গ্লুকোজ, ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন এবং ভিটামিন 'সি' মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটারে ২৫ গ্রাম গ্লুকোজ, ১ গ্রাম ভিটামিন WS, এবং ১ গ্রাম ভিটামিন 'সি') চিকগার্ডের পানির পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। অতপর চিকগার্ডের ভেতরে বাচ্চা ছাড়তে হবে। প্রয়োজনে বাচ্চা ছাড়ার পূর্বে বাচ্চার ঠোঁট গ্লুকোজ ও ভিটামিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে পানি পান করাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাচ্চা ছাড়ার পর কমপক্ষে ৩ ঘন্টা ভিটামিন মিশ্রিত পানি পান করার পর বাচ্চার পরিপাকতন্ত্র সচল হলে প্রথম দিন গম বা ভূট্টার দানা বা বাচ্চার জন্য তৈরিকৃত খাদ্যের যোগান দেয়া যেতে পারে। তারপর লেয়ার স্টারটার সরবরাহ করা হয়। লেয়ার স্টারটারে শতকরা ১৬-১৭ ভাগ প্রোটিন ২৮০০-২৯০০ কিলো ক্যালরি বিপাকীয় শক্তি (ক্যালরি/কেজি) থাকে। প্রথম সপ্তাহে প্রতিটি বাচ্চার জন্য গড়ে ৬-৮ গ্রাম খাবার দরকার হয়।

মুরগির সঠিক জাত বা স্ট্রেইন নির্বাচন

মুরগির খামারে লাভ-ক্ষতির অনেক অংশ নির্ভর করে উপযুক্ত ও সঠিক মুরগির জাত বা স্ট্রেইন নির্বাচনের ওপর। আবহাওয়া, খাদ্যের গুণগতমান, ঘরের ধরন ও ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে সঠিক জাত বা স্ট্রেইন নির্বাচন করতে হবে। খামারের জন্য এক দিনের বাচ্চা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গুণগত মানসম্পন্ন নিরোগ বাচ্চা ভালো উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরি এবং সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

গুণগত মান সম্পন্ন খাদ্য এবং তার সঠিক ব্যবহার মুরগি পালনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি মুরগি পালনে খাদ্যে প্রায় ৬০-৭০ ভাগ খরচ হয়। ভালো খাদ্য তৈরি বা ক্রয় এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহার লাভজনক মুরগি পালনে অত্যাবশ্যক।

বাড়ন্ত বাচ্চা পালন

ব্রুডিং শেষে ১৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময় কালকে সাধারনত বাড়ন্ত অবস্থা বলা হয়। এ সময়টা ডিম পাড়া মুরগির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা বাড়ন্ত অবস্থার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ ডিম উৎপাদন। বাড়ন্তকালীন সময়ে ঝাঁকের সমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঝাঁকের সব মুরগি গুলোর দৈহিক ওজন কাছাকাছি না থাকলে সবল বাচ্চা প্রতিযোগিতা করে বেশি খাদ্য খেয়ে ফেলে আর দুর্বল বাচ্চাগুলো আরো দুর্বলতর হতে থাকে। তাই সকল বাচ্চার মধ্যে সমতা আনায়নের জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল বাচ্চার দিকে নিবিড় তদারকির বিশেষ প্রয়োজন।

সমতা রক্ষার জন্য খাদ্য গ্রহণের স্থান অর্থাৎ খাদ্য পাত্রের সংখ্যা অধিক গুরত্বপূর্ণ। খাবার পাত্র ও পানির পাত্রের সংখ্যা কম হলে বাচ্চার দৈহিক ওজনের সমতা আনয়নে ব্যাঘাত ঘটে। বাংলাদেশে প্রচলিত খাদ্য পাত্রে সাধারণত ১৪টি বা ১৮টি মুরগির একত্রে খাদ্য গ্রহণের স্থান থাকে। তাই মোট মুরগির সংখ্যাকে ১৪ কিংবা ১৮ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তার পূর্ণ সংখ্যা হিসাব করে খাদ্য পাত্র স্থাপন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। পানির পাত্রের ক্ষেত্রেও অনুরুপ ব্যবস্থা নিতে হবে। মুরগির বাড়ন্ত অবস্থায় ঠোঁট কাটলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ঠোঁট না কাটলে প্রতিদিন মুরগির ঘরে শাক সবজি পরিষ্কার করে ঝুলিয়ে রাখলে ঠোকরা ঠুঁকরির মত বদ অভ্যাস অনেক কমে যাবে। তবে লেয়ার মুরগিকে দুই বার ঠোঁট কাটা উত্তম। এক বার ৬-১৪ দিনের মধ্যে এবং আর এক বার ১২-১৬ সপ্তাহ বয়সে। কোন কোন সময় তিন বারও ঠোঁট কাটার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

প্রি- লেয়ার

সাধারণত ১৮-২০ অথবা ১৮-২২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত মুরগিকে প্রি-লেয়ার বলা হয়। এ সময় মুরগির ঝাঁকের গড় ওজন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি আছে কি না তা পরীক্ষা করা দরকার। এই সময় বাড়ন্ত রেশনের পরিবর্তে প্রি-লেয়ার রেশন সরবরাহ করা প্রয়োজন। ২০ সপ্তাহ বয়েসে ঝাঁকের ওজন লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি থাকলে দিনের আলোর সাথে অতিরিক্ত আলো সরবরাহের মাধ্যমে উদ্দীপনা দেয়া প্রয়োজন। এ সময় ডিম উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ অতিক্রম করলে প্রি-লেয়ার ফিডের পরিবর্তে লেয়ার ফিড সরবরাহ করতে হবে। পুলেট কালিন সময়ের শুরুতে মুরগির ঘরে ডিম পাড়ার বাক্স বসাতে হবে।

ডিমপাড়া মুরগি পালন

মুরগির যখন ডিম দেয়া শুরু করবে তখন থেকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো ধরনের বদ অভ্যাস সৃষ্টি হয় হয় কি না যেমন অনেক ক্ষেত্রে মুরগির ডিম ভেঙে ফেলে, মলদ্বার ঠোকরানো অথবা ডিম ভেঙে খাওয়া শুরু করা। এ সমস্ত বদঅভ্যাস যদি দেখা দেয় তবে শ্রীঘ্রই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন কারণে এগুলো হতে পারে এ জন্য প্রথমেই কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞ পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। ডিমপাড়া কালিন সময়ে আলো প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গড়ে ১৬ ঘন্টা আলোক প্রদান, আদর্শ ডিম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন। খাদ্য ও পানি সরবরাহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সরবরাহ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে ডিম উৎপাদনের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই রুটিনমাফিক কাজ, লাভজনক পোল্ট্রির পালনের চাবিকাঠি। এ সময় মুরগির ডিমপাড়ার জন্য ডিমপাড়ার বাক্স ঘরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। প্রতি ৪-৫ টি মুরগির জন্য ১টি ডিমপাড়ার বক্স বরাদ্দ রাখতে হয়। ডিম পাড়া বাক্সের পরিমাপ ১ x ১ x ১.২৫ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) ঘনফুট হলেই চলে। মুরগির ঘরের অন্ধকার যুক্তস্থানে যেখানে কম আলো এবং যেখানে মুরগি কম চলাফেরা করে সেই স্থানে মুরগির ডিম পাড়ার বাসা দিতে হবে। ডিম পাড়া বাসার সাথে পরিচিতির জন্য অন্তত ২ সপ্তাহ আগে থেকেই ডিম পাড়ার বাসা ঘরে স্থাপন করতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাদ্য প্রস্তুত এবং খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান অংশ। খাদ্য উপাদান ক্রয়ের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ জন্য খাদ্য সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। খাদ্যের গুণগতমান অবশ্যই ভালো হতে হবে। নিম্নের চারটি রেশনের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এদের কার্যকারিতা অত্যন্ত ভালো।

স্টারটার রেশন

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
১।	গম	৩৫ কেজি
২।	ভূট্টা	১৬.৯ কেজি
৩।	সয়াবিন	২৭.০ কেজি
৪।	চালের কুঁড়া	১৪.৮ কেজি
৫।	ঝিনুক চূর্ণ	১.৫ কেজি
৬।	ডি সি পি	১.৫ কেজি
৭।	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫ কেজি
৮।	লাইসিন	০.১৫ কেজি
৯।	মিথিওনিন	০.১৫ কেজি
১০।	সয়াবিন তেল	২.৫০ কেজি
১১।	খাবার লবণ	০.২৫ কেজি
	মোট	১০০.০০ কেজি
পুষ্টি		
	প্রোটিন	২১.৭৪ কেজি
	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি/কেজি)	২৯৬০ কেজি
	লাইসিন (%)	১.২২ কেজি
	মিথিওনিন (%)	০.৪৩ কেজি
	ক্যালসিয়াম (%)	১.৫ কেজি
	ফসফরাস (%)	০.৮৬ কেজি

গ্রোয়ার রেশন

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
১।	গম	২২ কেজি
২।	ভূট্টা	৩০ কেজি
৩।	সয়াবিন	২৮ কেজি
৪।	চালের কুঁড়া	১৫ কেজি
৫।	ঝিনুক চূর্ণ	১.৫ কেজি
৬।	ডি সি পি	২.৫ কেজি
৭।	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.৫ কেজি
৮।	লাইসিন	০.১২৫ কেজি
৯।	মিথিওনিন	০.১২৫ কেজি
১০	খাবার লবণ	০.২৫ কেজি
	মোট	১০০.০০ কেজি
পুষ্টি		
	প্রোটিন	২০.৬২ কেজি
	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি/কেজি)	৩০৩৩ কেজি
	লাইসিন (%)	১.১৫ কেজি
	মিথিওনিন (%)	০.৩৯ কেজি
	ক্যালসিয়াম (%)	১.৫ কেজি
	ফসফরাস (%)	০.৮৯ কেজি

পুলেট রেশন

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
১।	গম	২৩ কেজি
২।	ভূট্টা	৩৬ কেজি
৩।	সয়াবিন	১৭ কেজি
৪।	চালের কুড়া	১৯.৩ কেজি
৫।	ঝিনুক চূর্ণ	২.৫ কেজি
৬।	ডি সি পি	১.৫ কেজি
৭।	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫ কেজি
৮।	লাইসিন	০.১০ কেজি
৯।	মিথিওনিন	০.১০ কেজি
১০	খাবার লবণ	০.২৫ কেজি
	মোট	১০০.০০ কেজি
পুষ্টি		
	প্রোটিন	১৬.৭৯ কেজি
	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি/কেজি)	৩১২৫ কেজি
	লাইসিন (%)	০.৮৫ কেজি
	মিথিওনিন (%)	০.৩৩ কেজি
	ক্যালসিয়াম (%)	১.৫ কেজি
	ফসফরাস (%)	০.৯০ কেজি

লেয়ার রেশন

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
১।	গম	১৬ কেজি
২।	ভূট্টা	৪০ কেজি
৩।	সয়াবিন	২২ কেজি
৪।	চালের কুঁড়া	১৪.৩ কেজি
৫।	ঝিনুক চূর্ণ	১.৫ কেজি
৬।	ডি সি পি	১.৫ কেজি
৭।	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	৪.০ কেজি
৮।	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫ কেজি
৯।	লাইসিন	০.১০ কেজি
১০	মিথিওনিন	০.১০ কেজি
	মোট	১০০.০০ কেজি
পুষ্টি		
	প্রোটিন	১৭.০০ কেজি
	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি/কেজি)	৩০৪৫ কেজি
	লাইসিন (%)	০.৯৫ কেজি
	মিথিওনিন (%)	০.৩৪ কেজি
	ক্যালসিয়াম (%)	২.৫ কেজি
	ফসফরাস (%)	০.৮০ কেজি

তবে উপরোক্ত রেশনে যে সমস্ত সদস্য উপদান ব্যবহার করা হয়েছে তা সময়, আবহাওয়া এবং ঋতু পরিবর্তন এবং সহজলভ্যতার ওপর নির্ভর করে। এছাড়াও খামারিগণ বাজারে প্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য বয়স অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন।

আলোক ব্যবস্থাপনা

আলোক ব্যবস্থাপনা ডিম পাড়া মুরগির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দিনের সুনির্দিষ্ট ঘন্টা আলোর ব্যবস্থাপনার সাহায্যে মুরগির সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

লেয়ার মুরগির জন্য প্রস্তাবিত ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচি

মুরগির বাচ্চা থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত ভ্যাকসিন কর্মসূচি সাধারণত HI ট্রাইটার দেখে ভ্যাকসিন দেয়া উচিত। এতে মুরগি রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা কম হবে এবং বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা করা সহজতর হয়। ভ্যাকসিন কর্মসূচি পোল্ট্রি ডিজিজ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত।

বয়স (দিন)	তারিখ	ভ্যাকসিনের নাম	মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি
১০		এন.ডি ক্লোন-৩০ (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোঁটা
১৪		গামবোরো ডি-৭৮ (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোঁটা
২১		গামবোরো ডি-৭৮ (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোঁটা
২৪		এন.ডি ক্লোন-৩০ (ম্যানোভ্যালেন্ট) (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোঁটা
২৮		গামবোরো কিল্ড ভয়েল অ্যাডজুভ্যান্ট (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	চামড়ার নিচে অথবা মাংশপেশিতে ঃ ০.২৫ মিঃলিঃ/মুরগী
৩৮		এন.ডি.কিল্ড ভয়েল অ্যাডজুভেন্ট (১০০০ ডোজ/ভায়াল) এন ডি. এইচ. আই টেস্ট	চামড়ার নিচে অথবা মাংশপেশিতে ঃ ০.২৫ মিঃলিঃ/মুরগি
৪০		ফাউল পক্স (ওভো ডিপথেরিন) (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	পাখার চামড়ার সুঁচ ফুটানোর মাধ্যমে
৬৮		এন.ডি.এইচ.আই. এন্টিবডি টাইটার পর্যবেক্ষন	-
৭০		ফাউল পক্স (ওভো-ডিপথেরিন) (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	পাখার চামড়ার সুঁচ ফুটানোর মাধ্যমে
১২০		এন.ডি.কিল্ড ভয়েল অ্যাডজুভেন্ট (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	চামড়ার নিচে অথবা মাংশপেশিতে ০.৫ মিঃলিঃ/মুরগি
৫ মাস		এন ডি. এইচ. আই এন্টিবডি টাইটার দেখা	
১২ মাস		ঐ	
১৮ মাস		ঐ	
২৪ মাস		ঐ	

উপরোক্ত ভ্যাকসিনগুলো যেহেতু ১০০০ ডোজ প্রতি ভায়ালে পাওয়া যায়, তাই ২০০টি মুরগি পালনকারী ৫ জন খামারি অনায়াসে ১টি ভায়াল ব্যবহার করতে পারেন। তবে খামারিদের সমিতিভুক্ত করে ভ্যাকসিন কর্মসূচি প্রয়োগ করলে আর্থিক খরচ কম হবে।

উপকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা

দেশের গ্রামীণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণের সরবরাহ উপকরণের মাধ্যমে বিতরণ করলে সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকলে, সে ক্ষেত্রে খামারিদের সাথে একটি প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/এনজিও এই মর্মে চুক্তি করবে যে, প্রথম সপ্তাহ থেকে ২২ সপ্তাহ পর্যন্ত (ডিমপাড়া শুরু হওয়া পর্যন্ত) বাচ্চা লালন-পালন, খাদ্য ও ভ্যাকসিন, ইত্যাদি খরচ ক্রেডিট হিসেবে খামারিদের মাঝে সরবরাহ করবে এবং খামারিগণ মুরগির শতকরা ৫০ ভাগ ডিম পাড়া শুরু করলে উপরোক্ত উপকরণ বাবদ খরচ ডিম থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের মাধ্যমে সাপ্তাহিক কিস্তিতে সংগঠনকে পরিশোধ করবে। প্রতিষ্ঠানটি খামারিদের মাঝে নিম্নলিখিত উপকরণ প্রদানপূর্বক একটি চুক্তি করবে ঃ

১. গুণগত মানসম্পন্ন মুরগির বাচ্চা

২. ভ্যাকসিন/টিকা

৩. গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য

৪. প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, ভিটামিন-প্রিমিক্সি

৫. জীবাণুনাশক

খামারিগণ আর্থিকভাবে সমর্থ হলে নিজেরাও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ খরচে লেয়ার পালন শুরু করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে মুরগি পালনের উপকরণসমূহ সঠিকভাবে বাছাই, সংগ্রহ, ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় উপজেলা পশুসম্পদ অফিসের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন। আর্থিক সহায়তার জন্য স্থানীয় ব্যাংকে সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

সংগঠনের মাধ্যমে সকল উপকরণ ক্রয় এবং খামারের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়

খামারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে একত্রে সংগ্রহ করলে আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে। খাদ্য, ভ্যাকসিন, জীবাণুনাশক ইত্যাদি সামগ্রী ক্ষুদ্র খামারি যৌথভাবে সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করে অর্থের সাশ্রয় করতে পারে। একইভাবে উৎপাদিত পণ্য-ডিম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দলগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফড়িয়ার অংশের লাভ সমিতি ভোগ করতে পারে।

ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ডিমপাড়া শুরু করলে খামারিগণ প্রতিদিনই দুই বার ডিম সংগ্রহ করেন এবং ডিমের ট্রেতে রাখতে হবে। যে সমস্ত স্থানে আলো-বাতাস ভালভাবে চলাচল করে সে সমস্ত স্থানে ডিম সংরক্ষণ করা ভাল। ডিম সাধারণত ৭ দিনের সাধারণ তাপমাত্রায় এভাবে না সংরক্ষরণ করাই উত্তম।

ডিম বাজারজাতকরণ

খামারিগণ সংগঠনের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করতে পারেন। সংগঠনের

আওতায় খামারিগণ প্রতি ৭ দিনের ডিম সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে জমা রাখবেন এবং প্রতি ৭ দিন পর পর গ্রামীণ ফড়িয়াদের নিকট অথবা সরাসরি আড়ৎদারগণের নিকট বিক্রি করতে পারবেন। এই পদ্ধতিতে খামারিগণ আড়ৎদারদের সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। বাজারজাতকরণের ভালো সুযোগ-সুবিধা না থাকলে অনেক সময় খামারিগণ কম মূল্যে ডিম বিক্রি করতে বাধ্য হন। ছাটাইকৃত মুরগিও খামারিগণ সরাসরি আড়ৎদারের নিকট বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারেন। এ ছাড়া, মুরগির বিষ্টা মাছের খামারি ও অন্যান খামারিদের নিকট বিক্রি করে লাভবান হতে পারে।

খরচাদি ও লাভ

খরচাদি এবং লাভ ঃ ২০০টি লেয়ার পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

আইটেম	ব্যয়	আয়
ঘর বাবদ খরচ	৪০০০.০০	
বাচ্চা	৪৮০০.০০	
ভ্যাকসিন মেডিসিন	৪৪২৯.০০	
খাদ্য বাবদ খরচ	১৪২৯২৯.০০	
ফিডার ড্রিংকার	৮০৪.০০	
মোট খরচ	১,৫৬,৯৬২.০০	
আয়		
ডিম		১৮১৪০৮.০০
নন লেইং বার্ড		১৮০০.০০
ছাটাইকৃত মুরগি		১৫৭৫০.০০
লিটার/ বিষ্টা	৮০ X ৫০	৪০০০.০০
মোট আয়		২,০২,৯৫৮.০০
নিট আয়	২,০২,৯৫৮.০০-১,৫৬,৯৬২.০০	৪৫৯৯৬.০০

খাদ্য ও ডিমের দামের ওঠা-নামার কারণে লাভ কম বা বেশি হতে পারে।

উপরোক্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, এই মডেলে ২০০টি মুরগি পালনকারীর সর্বমোট খরচ হয় ১,৫৬,৯৬২ এবং মোট আয়ের পরিমাণ ২,০২,৯৫৮ টাকা। প্রকৃত আয় থেকে খরচ বাদ দিলে নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫,৯৯৬ টাকা। বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের এক তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের একজন মানুষের বার্সিক জীবনধারণের জন্য যেমন, খাদ্য এবং অন্যান্যসহ খরচ হয় প্রায় ৯০০০ টাকা এবং ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের বাৎসরিক ব্যয় হয় ৩৬০০০/= টাকা। সুতরাং ২০০টি মুরগি পালনকারী ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার সংসারের খরচাদি ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষাসহ যাবতীয় খরচ মিটিয়ে বছরে প্রায় ৯০০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য, ৪ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের খরচ যথাক্রমে খাদ্য (৩৯%), শিক্ষা (২৮%), বিনোদন (১৭%), জামাকাপড় (১০%) ও অন্যান্য (৬%), যা লেয়ার পালন করে মেটানো সম্ভব।

নিয়মিতভাবে সদস্যদের মতবিনিময় সভা

মডেলটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পোল্ট্রি উৎপাদন সমিতি গঠন বিশেষ কার্যকর। উক্ত সমিতি প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধার আলোকে একটি নিয়মিত বিরতিতে (সপ্তাহে/মাসে/প্রতি মাসে) আলোচনা

সভা করবে। উক্ত আলোচনার মাধ্যমে মডেলের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন, খামার পরিচালনার সমস্যা ও অন্যান্য সকল বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বা নির্ধারণ করার সুযোগ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী সংগঠনের একটি গঠনতন্ত্র থাকা অত্যাবশ্যক।

সংগঠনের সদস্যদের জন্য আপদকালীন আর্থিক সংস্থান করা

সংগঠনের আয়ের অর্থ থেকে বা মাসিক চাঁদার ভিত্তিতে কিংবা লভ্যাংশের কিছু অর্থ থেকে নিয়মিতভাবে সংগঠনের জন্য ব্যাংক একাউন্টে অর্থ জমা করা প্রয়োজন। সদস্যভুক্ত খামারিরা খামারের জরুরি বা আপদকালীন প্রয়োজনে উক্ত অর্থ থেকে বিশেষ ঋণের সুযোগ গ্রহণ করবে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা ও ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত লেয়ার মডেলটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিরা বসতবাড়িতে পালন করলে দারিদ্র্যবিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, পারিবারিক পুষ্টিসহ সামাজিক মার্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্যাকেজের উদ্ভাবক ঃ ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, ড. মোঃ সালাহ্‌ উদ্দিন, ড. নাথুরাম সরকার, দুলাল চন্দ্র পাল, মোঃ আব্দুর রশীদ, মোঃ শামীম আহমেদ, ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন ও ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

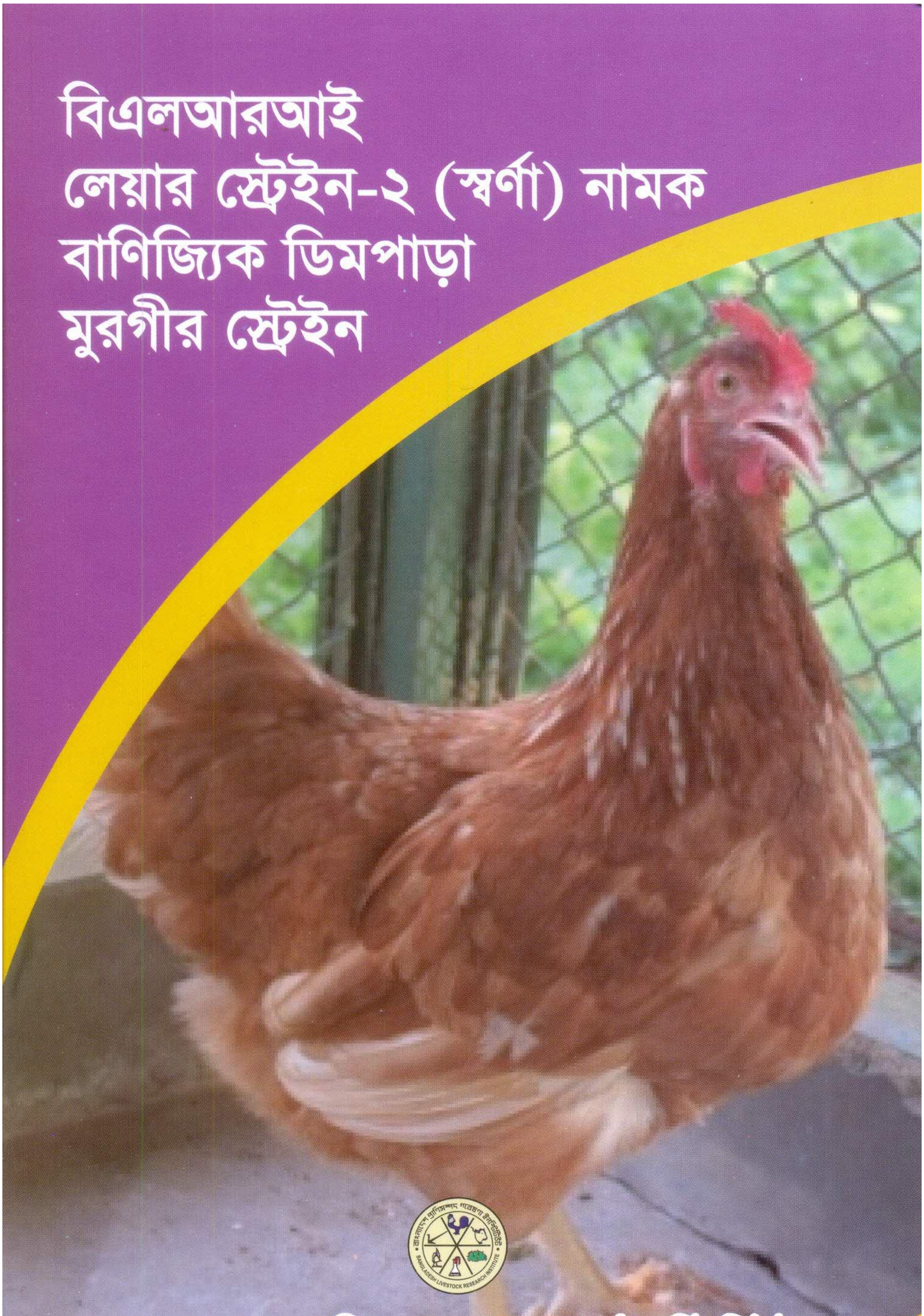
বিএলআরআই
লেয়ার স্ট্রেইন-২ (স্বর্ণা) নামক
বাণিজ্যিক ডিমপাড়া
মুরগীর স্ট্রেইন
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

প্রযুক্তির নাম ঃ বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ (স্বর্ণা) নামক বাণিজ্যিক ডিমপাড়া মুরগীর স্ট্রেইন

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল দেশ হওয়ায় প্রয়োজনের তুলনায় প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পুরণে, বিগত তিন দশকে পোল্ট্রি শিল্প এ দেশের একটি সম্ভাবনায় অর্থনৈতিক খাতে পরিণত হয়েছে। তবে, দেশে একদিন বয়স্ক বাচ্চার চাহিদার যোগান দিতে বিদেশ থেকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে আমদানি করা প্যারেন্ট এবং গ্রান্ড প্যারেন্ট মুরগির উপর নির্ভরশীল হতে হয়। ফলে, একদিন বয়স্ক বাচ্চার বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, বিশ্বের খ্যাতনামা পোল্ট্রি ব্রিডিং কোম্পানিগুলোর বেশিরভাগই শীতপ্রধান দেশে অবস্থিত অথচ তাদের উদ্ভাবিত পোল্ট্রি ব্রীড/স্ট্রেইন গ্রীষ্মপ্রধান বাংলাদেশ আমদানি করে থাকে। যে কারণে এ দেশের আবহাওয়ায় ঠিকমত খাপ খেতে না পারায় উৎপাদন দক্ষতার তারতম্য হয়। তাই, বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী মুরগির ব্রীড/স্ট্রেইন উদ্ভাবন করা গবেষকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর পোল্ট্রি বিজ্ঞানীবৃন্দ উন্নত পিওর লাইন থেকে ধারাবাহিক সিলেকশন ও ব্রিডিং এর মাধ্যমে সম্প্রতি একটি গাঢ় বাদামী বা সোনালী বর্ণের ডিম পাড়া মুরগীর স্ট্রেইন উদ্ভাবন করেছে। লাল ঝুঁটি ও সোনালী পালক বিশিষ্ট উদ্ভাবিত নতুন জাতের মুরগীকে "বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ বা স্বর্ণা" নামে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা ঃ

ইতোমধ্যে, গবেষণা খামার পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে স্ট্রেইনটির ৫টি প্রজন্ম লালন-পালন করে ডিমের উৎপাদন দক্ষতা যাচাই করা হয়েছে এবং আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে। স্বর্ণার একদিন বয়স্ক বাচ্চার পালকের রং দেখেই এর মেল-ফিমেল সনাক্ত করা যায় (ফিমেল বাচ্চার পালকের রং হালকা বাদামী আর মেল বাচ্চার রং সাদা বর্ণের)। স্বর্ণা জাতের মুরগী অন্যান্য বাণিজ্যিক হাইব্রিড জাতের মতোই ১৯ সপ্তাহ বয়সে ডিম দেয়া শুরু করে এবং একটানা ৮০ সপ্তাহ পর্যন্ত লাভজনক হারে ডিম দেয় এবং বার্ষিক ডিম উৎপাদন সংখ্যা ২৯৫-৩০০ টি। এছাড়াও, বাণিজ্যিক জাতের মুরগীর (ISA Brown) সাথে তুলনামূলক গবেষণা করে দেখা গেছে যে, স্বর্ণা জাতের মুরগীগুলো বাণিজ্যিক জাতটির তুলনায় অধিক তাপসহিষ্ণু এবং উৎপাদিত ডিমের গড় ওজন প্রায় ৫ গ্রাম বেশি। তাই, গ্রীষ্মকালীন উচ্চ তাপমাত্রায় (৩৫-৩৮° সে.) স্বর্ণা মুরগীর ডিম উৎপাদন হারে তেমন তারতম্য হয় না। উদ্ভাবিত জাতটি টাঙ্গাইল, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফেনী ও নীলফামারী জেলায় খামারী পর্যায়ে উৎপাদন দক্ষতা ও লাভ ক্ষতির অর্থনৈতিক বিশ্লেষন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ফলাফল গবেষণা খামারের ফলাফলের সহিত সামঞ্জস্য রয়েছে। এসব গবেষণা প্রতিবেদন থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণার উৎপাদন দক্ষতা বাণ্যিজিক মুরগীর সাথে তুলনীয় এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান আবহাওয়া উপযোগী।

স্বর্ণা মুরগীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ঃ

পালকের রং	:	সোনালী (Golden)
দেহের আকার	:	ত্রিকোনাকৃতি
চামড়ার রং	:	সাদাটে (Off white)
ঝুঁটির রং	:	লাল
ঝুঁটির প্যাটার্ন	:	একক (Single comb)
গলার পালক	:	স্বাভাবিকভাবে বিন্যস্ত
ডিমের খোসার রং	:	বাদামী
পায়ের নলার রং	:	হালকা হলুদ

স্বর্ণা মুরগীর উৎপাদন দক্ষতা ঃ

একদিন বয়স্ক বাচ্চার ওজন	:	৪০-৪২ গ্রাম
প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগীর দৈহিক ওজন	:	১৭৫০-১৮৫০ গ্রাম
প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগীর দৈনিক খাদ্য গ্রহণ	:	১১৫-১২০ গ্রাম
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স	:	১৯-২০ সপ্তাহ
বার্ষিক ডিম উৎপাদনের সংখ্যা	:	২৯৫-৩০০ টি
বার্ষিক গড় ডিম উৎপাদন হার	:	৮০-৮১.৫%
ডিমের গড় ওজন	:	৬৫-৬৬ গ্রাম
খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা	:	২.২০-২.৩০

আর্থ-সামাজিক প্রভাব/আয় ও ব্যয়ের হিসাব ঃ

বিএলআরআই ও খামারী পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ১০০০ টি স্বর্ণা মুরগীর একটি ব্যাচ ৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত পালন করে বাজার মূল্যভেদে ২ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাভ করা যায় (সারণী-১)। স্বর্ণা মুরগী দেশীয় আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এর মৃত্যুহার বাইরে থেকে আমদানি করা বাণিজ্যিক মুরগীর তুলনায় কম। এছাড়াও, মুরগীগুলো অধিক তাপমাত্রায় পালন উপযোগী হওয়ায় হিট স্ট্রোকে মৃত্যুহার কম হয়। স্বর্ণা মুরগীর ডিমের গড় ওজন বাণ্যিজিক মুরগীর তুলনায় প্রায় ৫ গ্রাম বেশি, ফলে এগ মাংস উৎপাদন বেশি হয়। তাই, খোলা বাজারে খামারী ডিমের হালি প্রতি ১.৫-২ টাকা বেশি মুল্য পেয়ে থাকেন। তাছাড়াও, মুরগীগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামুলক বেশি হওয়ায় কোন ধরনের এন্টিবায়েটিক ছাড়াই তালিকা মোতাবেক ভ্যাকসিন প্রয়োগ ও অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিন-মিনারেল দিয়েই সফলভাবে পালন করা যায়, ফলে মুরগী প্রতি ঔষধ খরচ কম হবে। মুরগীগুলো মেঝে ও খাচাঁয় সমান তালে পালন উপযোগী হওয়ায় প্রান্তিক খামারীগণ সহজেই নিজের উপযোগী ব্যবস্থায় পালন করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, স্বর্ণা লেয়ার স্ট্রেইনটি আমাদের দেশীয় পরিবেশে উদ্ভাবিত হওয়ায় এর উৎপাদন খরচ অনেক কম হবে এবং খামারীরা স্বল্পমূল্যে স্বর্ণার বাচ্চা ক্রয় করতে পারবেন। ফলে, একদিন বয়স্ক বাণিজ্যিক লেয়ার বাচ্চার উর্ধ্বমুখী দামে সহজেই লাগাম দেয়া যাবে এবং বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় দেশি আবহাওয়া উপযোগী অধিক ডিম উৎপাদনকারী মুরগির স্ট্রেইনটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

সারণী-১: ১০০০ টি স্বর্ণা মুরগীর ১টি ব্যাচের আয়-ব্যায়ের হিসাবঃ

নিয়ামক	খাত	টাকার পরিমাণ
ব্যয়	মোট স্থায়ী খরচ	৫০,০০০-৬০,০০০
	মোট পরিবর্তনশীল খরচ	১৩,২০,০০০-১৩,৪০,০০০
	মোট খরচ	১৩,৭০,০০০-১৪,০০,০০০
আয়	স্থুল আয়	১৬,৫০,০০০-১৭,০০,০০০
	নিট লাভ	২,৮০,০০০-৩,০০,০০০
	মোট পরিবর্তনশীল খরচের উপর নিট লাভ	৩,৩০,০০০-৩,৫০,০০০
	আয় ও ব্যয়ের অনুপাত	১.২০৩-১.২১৪ : ১

উপসংহারঃ

নতুন উদ্ভাবিত স্বর্ণা লেয়ার স্ট্রেইন সরকারি-বেসরকারি খামারে সঠিকভাবে সম্প্রসারণ করতে পারলে একদিকে স্বল্পমূল্যে প্রান্তিক খামারিগণ অধিক ডিম উৎপাদনকারী লেয়ার বাচ্চা পাবেন, অন্যদিকে আমদানি নির্ভরতা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। এছাড়া, একদিন বয়স্ক লেয়ার বাচ্চার বাজারমুল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এ প্রযুক্তিটি দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়ার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায় ।

গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবক

* **ড. মোঃ রাকিবুল হাসান**, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
* **মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ**, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
* **মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী**, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
* **ড. শাকিলা ফারুক**, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
* **ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার**, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
* **হালিমা খাতুন**, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা
* **ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন**, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ এবং পরিচালক, এন.আর.এল-এ.আই

গবেষণা সমন্বয়কারী

ড. নাথুরাম সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১, ফোন: ৭৭৯১৬৭০-২, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৭৭৯১৬৭৫
ই-মেইল: infoblri@gmail.com, web: www.blri.gov.bd

মুরগির উন্নত জাত

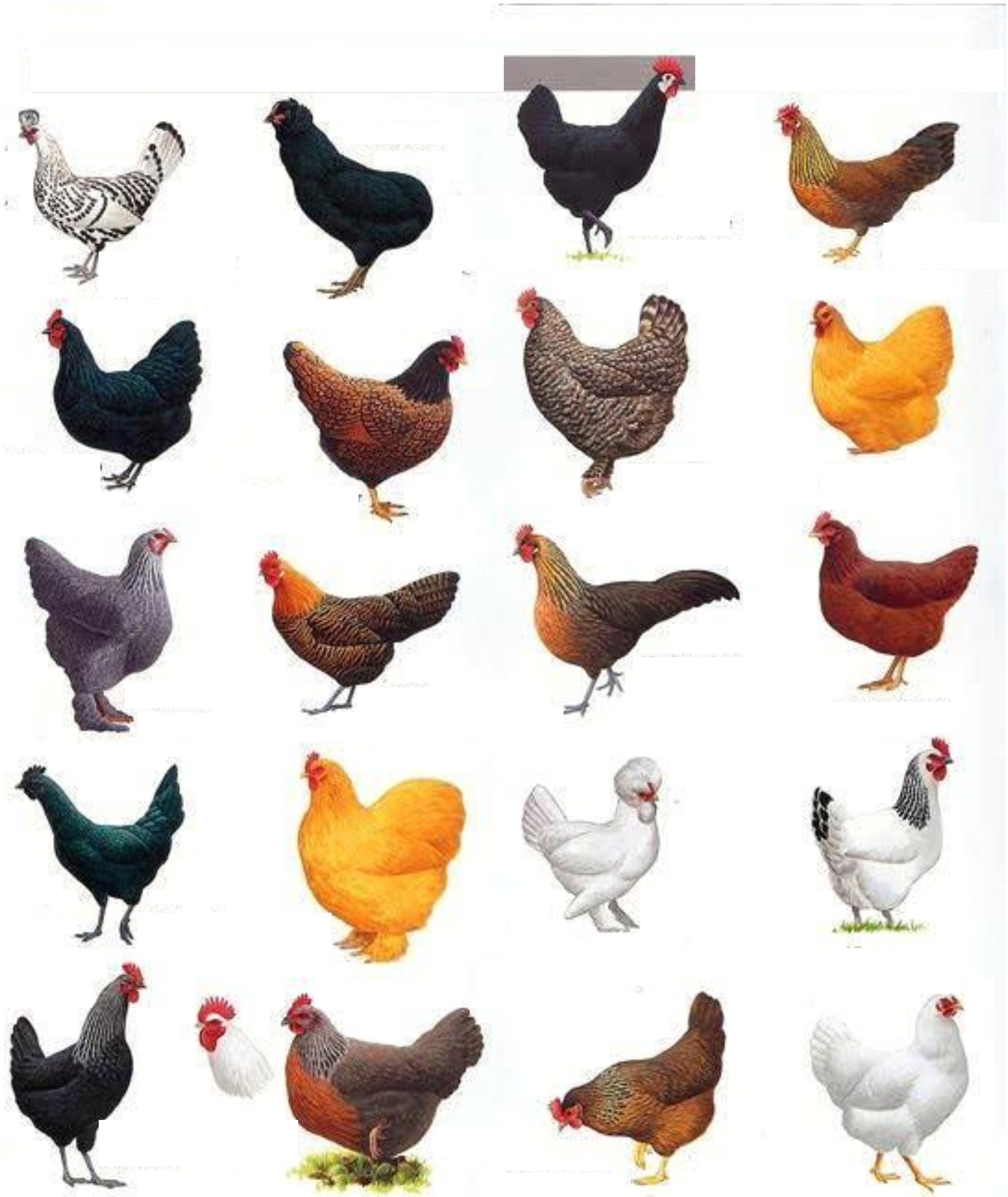

ব্রয়লার পালন

ভূমিকা

দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে ব্রয়লার পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ ছাড়াও বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, সর্বোপরি দেশের দারিদ্র্যবিমোচনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্রয়লার পালনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও পর্যায়ে কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করলেও কোনো লাগসই পরিকল্পনা অদ্যাবধি তাদের জন্য হাতে নেয়া হয় নি। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর বসতবাড়ি ব্যতীত চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই সামান্য এবং যা দ্বারা তাদের সারা বছরের খাবারের সংস্থান হয় না। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ২০২৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমান জনসংখ্যার তুলনায় দ্বিগুণ হবে এবং চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ যা আছে তা থেকে প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রয়লার পালনের ওপর একটি লাগসই মডেল উদ্ভাবন করেছে। এ মডেলের আওতায় একজন ক্ষুদ্র অথবা মাঝারি আকারের খামারি প্রথমত ৫০০ টি ব্রয়লার পালন করে সংসারিক খরচ চালানোর পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টি মিটিয়ে ধীরে ধীরে ব্রয়লার পালনকে আত্ম-কর্মসংস্থানের মূল চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, একজন খামারি প্রতি বছর কমপক্ষে ৬ ব্যাচ ব্রয়লার পালন করতে পারেন, যা দ্বারা ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি গ্রামীণ পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় মেটানো সম্ভব। ব্রয়লার পালন

দারিদ্র্যবিমোচনে সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টি অভাব পূরণে বিশেষ ভূমিকা রারে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ১ কেজি ব্রয়লার উৎপাদন করতে ৩০-৩২ দিন সময় লাগে এবং এর জন্য মাত্র ১.৯ কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এত অল্পসময়ে অন্য কোনো খাত থেকে উন্নতমানের আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দেয়া ও স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব নয়।

ব্রয়লার মডেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ব্রয়লার পালন মডেলটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত অংগগুলো (Componant) সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১. খামারি বা সুফলভোগী নির্বাচন,

২. খামারদের সংগঠন তৈরি,

৩. খামারিদের পারিবারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে,

৪. বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক ঘর তৈরি/স্থান নির্বাচন,

৫. ব্রয়লার বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা,

৬. ব্রয়লারের জন্য জাত/স্ট্রেইন নির্বাচন,

৭. সুষম খাদ্য তৈরি করণ,

৮. ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা,

৪. খামারি সংগঠনের মাধ্যমে উপকরণ ক্রয় এবং উৎপাদিত ব্রয়লার বাজারজাতকরণ,

৫. খামারিদের মধ্যে মতবিনিময় সভা,

৬. সংগঠনের মাধ্যমে আপদকালীন আর্থিক সংস্থান।

১ ও ২। খামারি/সুফলভোগী নির্বাচন

বাংলাদেশের যে কোনো এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ১০-১২ জন উৎসাহী/আগ্রহী, স্বল্প শিক্ষিত, পরিশ্রমী ও সৎ মহিলা বা বেকার যুবককে খামারি হিসেবে নির্বাচনপূর্বক সংগঠিত করতে হবে। তবে নির্বাচিত খামারিদের যাতে ব্রয়লার খামার করার জন্য নিজস্ব জমি থাকে এবং সেই স্থানটি ব্রয়লার পালনের জন্য অবশ্যই যথোপযোগী হতে হবে। নির্ধারিত খামারিদের সংগঠনের আওতায় আসলে খামারিরা দলগতভাবে খাদ্য, টিকা ও খাদ্য মিশ্রিতকরণ প্রভৃতি কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া, খামরিরা তাদের খামার বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে একে অপরের সাথে মত বিনিময় করতে পারে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরাই প্রাথমিকভাবে সমাধান করতে পারবে।

নির্বাচিত খামারির পারিবারিক প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত খামারিদের ব্রয়লার পালনের ওপর তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক যেমন- ব্রয়লার বাচ্চা নির্বাচন, বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা, সুষম খাদ্য তৈরি, টিকাদান কর্মসূচি, খাদ্য সংরক্ষণ, ব্রয়লারের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার, বায়োসিকিউরিটি, আলোক ব্যবস্থাপনা, জীবাণুনাশকের ব্যবহারের গুরুত্ব, রেকর্ড সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাবের পাশাপাশি সকল বিষয়ে প্রশিণের ব্যবস্থা করা, যাতে একজন নতুন খামারি "হাতে কলমে শিখে" বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবারের দুইজন সদস্যকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, যাতে একজন পারিবারিক সদস্যের অনুপস্থিতিতে অন্যজন খামারের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। খামারের সকল কার্যক্রমে পারিবারিক সহযোগিতা নিশ্চিত হবে।

ফলোআপ প্রশিক্ষণ

দুই এক ব্যাচ ব্রয়লার পালনের পরে পুনরায় সমস্যাভিত্তিক খামারিদের একত্রিত করে ফলোআপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।

৪। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক ঘর তৈরি/স্থান নির্বাচন

(ক) খামারের জায়গা নির্বাচন

ব্রয়লার খামার স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পালন করা অতীব প্রয়োজনঃ

১. খামার তৈরির জন্য নির্বাচিত স্থান আবাসিক আবাসন থেকে একটু দূরে হওয়া প্রয়োজন,

২. অন্য মুরগির খামার বা প্রাণীর ঘর থেকে নিরাপদ দূরত্বে হতে হবে,

৩. পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে,

৪. খামারের আশপাশে পচা ডোবা ও নর্দমামুক্ত হতে হবে,

৫. বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুতের সুব্যবস্থা থাকতে হবে,

৬. বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে,

৭. ব্রয়লার সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের সহজলভ্যতা থাকতে হবে,

৮. খামার পরিচালনায় মালিকের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক।

(খ) ৫০০ ব্রয়লারের আদর্শ ঘর নির্মাণ

ব্রয়লারের জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় ঘর নির্মাণ করতে হয়। ঘরের চারপাশে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ৫০০ ব্রয়লারের জন্য (৪২+৫)X১২ = ৫৬৪ বর্গফুট জায়গা যথেষ্ট। এই জায়গার মধ্যে ৪২X১২ = ৫০৪ বর্গফুট জায়গা ব্রয়লারের জন্য এবং ৫X১২ = ৬০ বর্গফুট সার্ভিস কক্ষ। মাচা পদ্ধতিতে ঘর তৈরি করতে হবে।

ঘরের মাটি থেকে ৩ ফুট উঁচুতে মাচা থাকবে। মাটি থেকে মাচা পর্যন্ত ফাঁকা জায়গা তার জালি অথবা বাঁশের জালি দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হবে যাতে কুকুর, বিড়াল এবং অন্য কোন বন্য প্রাণী মাচার নিচে প্রবেশ করতে না পারে। ঘরের সার্ভিসকক্ষ ছাড়া বাকি তিন দিকে বাঁশের বা তার জালির বেড়া থাকবে যাতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে। ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হবে এবং ঘরের পশ্চিম প্রান্তে সার্ভিস কক্ষ থাকবে, যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস এক দিকে ঢুকে অন্য দিকে বের হতে পারে।

ঘরের বর্ণনা

ঘরের চালা

ঘরের চালা দোচালা হবে। ঘরের চালা ছন, গোলপাতা বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। তবে ছন ও গোলপাতার পরিবর্তে করুগেটেট টিন ব্যবহার করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে টিনের নিচে অবশ্যই তাপ নিরোধক বা বাশের চাটাই দিতে হবে অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পাশের বেড়া

পাশে বাঁশের বাতা দ্বারা তৈরি ফাঁক বেড়া বা তার জালির বেড়া দেয়া যেতে পারে। তবে বেড়ার ফাঁকগুলো কোনো মতেই ১ X ১ বর্গ ইঞ্চির বেশি হওয়া চলবে না।

সার্ভিস কক্ষ

সার্ভিস কক্ষে (৫ x ১২ = ৬০ বঃ ফুট) ব্রয়লারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, জীবাণুনাশকসহ অন্যান্য সরঞ্জাম থাকবে।

ব্রয়লার পালনে কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থাপনা ঃ

১. ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ

২. ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

৩. ব্রয়লার বাচ্চার প্রথম খাদ্য

৪. খাদ্য ব্যবস্থাপনা

* প্রয়োজনীয় পুষ্টি

* সুষম খাদ্য

মুরগির ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করণ

মুরগির ঘর তৈরির সকল কার্য শেষ হলে, ঘর পরিস্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ করা প্রয়োজন। প্রথমত ঝাড়ু দিয়ে মাচা ও মাচার নিচে, পাশের বেড়া ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে এবং সবশেষে জীবাণুনাশক (পভিসেপ, সুপারসেপ্ট, ক্লোরোক্স, আয়োসান, খায়োসান, ভিরকন এস) এর যে কোনো দ্রবণ দ্বারা ঘরের মাচা, পাশের বেড়া ও খামারের আশপাশ জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ঘরে মুরগির বাচ্চা উঠানোর ৩ (তিন) দিন পূর্বে পুনরায় জীবাণুমুক্তকরণ করতে হবে।

৫ ও ৬। বাচ্চা ক্রয় ও ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা ঘরে উঠানোর কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডিং-এর জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। খামারিদের জন্য ১০০০ বাচ্চা এক সাথে গ্রুপ করে ব্রুডিং করাই শ্রেয়; তাতে যেমন, অর্থের সাশ্রয় হয়, তেমনই পরিশ্রমও কম লাগে। এক দিনের ব্রয়লার বাচ্চা ভালো হ্যাঁচারি থেকে ক্রয় করতে হবে। ব্রয়লার হাইব্রিডগুলোর মধ্যে রয়েছে আরবর একর, হাবার্ড কাসিক, ভ্যানকব, হাইব্রো-পিএন ইত্যাদি। নির্বাচিত খামারিদের মধ্যে থেকে অধিক উদ্যোমী ভালো প্রশিক্ষণ খামারি দ্বারা ব্রুডিং করানো ভালো। শীতকালে সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করানো হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম সপ্তাহে ব্রুডিং তাপমাত্রা ৯৫° ফাঃ এ রাখা হয়, তারপর প্রতি সপ্তাহে ৫° ফাঃ করে কমাতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাসের চুলা, কেরোসিনের চুলা ও বিএলআরআই উদ্ভাবিত চিক ব্রুডার দিয়েও ব্রুডিং করা যায়।

৭। খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ক্রয়, সুষম রেশন ফর্মুলেশন, খাদ্য উপাদানসমূহ সঠিকভাবে মিশ্রিত করণ এবং খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান অংশ।

(ক) ব্রয়লার বাচচার প্রথম খাদ্য

ব্রয়লার বাচ্চা খামারে পৌছানোর পর পরই প্রথম গ্লুকোজ, ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন এবং ভিটামিন 'সি' মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটারে ২৫ গ্রাম গ্লুকোজ, ১ গ্রাম ভিটামিন WS, এবং ১ গ্রাম ভিটামিন 'সি') চিকগার্ডের পানির পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। অতপর চিকগার্ডের ভেতরে বাচ্চা ছাড়তে হবে। প্রয়োজনে বাচ্চা ছাড়ার পূর্বে বাচ্চার ঠোঁট গ্লুকোজ ও ভিটামিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে পানি পান করাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাচ্চা ছাড়ার কমপক্ষে ৩ ঘন্টা ভিটামিন মিশ্রিত পানি পান করার পর বাচ্চার পরিপাকতন্ত্র সচল হলে প্রথম দিন গম বা ভুট্টার দানা বা বাচ্চার জন্য তৈরিকৃত খাদ্য যোগান দেয়া বা সরবরাহ করা যেতে পারে। তারপর ব্রয়লার স্টারটার সরবরাহ করা হয়। ব্রয়লার স্টারটারে শতকরা ২১-২২ ভাগ প্রোটিন ২৮০০-২৯০০ কিলো ক্যালরি বিপাকীয় শক্তি (ক্যালরি/কেজি) থাকে । প্রথম সপ্তাহে প্রতিটি বাচ্চার জন্য গড়ে ৮-১০ গ্রাম খাবার দরকার হয়।

(খ) ব্রয়লার খাদ্য

ব্রয়লার খাদ্য তৈরি করার পূর্বে যে সমস্ত বিবেচনা করা দরকার তা নিম্নে দেয়া হলো।

- খাদ্যসামগ্রী ও উপকরণের সহজ প্রাপ্যতা,
- খাদ্য উপকরণের পুষ্টি মান,
- খাদ্য উপকরণের মূল্য,
- খাদ্যের পরিপাচ্যতা ও সুস্বাদুতা,
- পোল্ট্রি প্রজাতি, বয়স এবং উৎপাদন,
- খাদ্যের ফাংগাস এবং জীবাণুমুক্ততা,
- বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ব্যবহার করার পরিমাণ বা মাত্রা,
- সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান বিবেচনা করতে হবে।

খামারিদের সুবিধার জন্য নিম্নে দুইটি সুষম খাদ্যের নমুনা প্রদান করা হলো

উপাদান	১ নং নমুনা খাদ্য		২ নং নমুনা খাদ্য	
	পরিমাণ (কেজি)			
	স্টারটার (০-৪ সপ্তাহ)	ফিনিসার (৫-৬ সপ্তাহ)	স্টারটার (০-৪ সপ্তাহ)	ফিনিসার (৫-৬ সপ্তাহ)
গম	২৫.০০	২৫.০০	১৩	১২
ভূট্টা	২৮.০০	৩৩.০০	৪২	৪৭
চালের কুড়া	১৩.৫০	২২.৫০	১৩	১৫
সয়াবিন মিল	১০.০০	৪.০০	২২	১৮
তিলের খৈল	১৩.০০	৬.০০	-	-
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৫.০০	৫.০০	৮	৬
মিট অ্যান্ড বোন মিল	৫.০০	৪.০০	-	-
ঔষধ	০.২৫০	০.২৫০	-	-
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০
পুষ্টি				
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি)	২৯০০	৩০০০	২৯১৮	২৯৯৬
প্রোটিন (%)	২৩	২০	২১.১৩	১৯.১০
ক্যালসিয়াম (%)	১.১১	০.৮৭	১.২৩	০.৯৭
প্রাপ্ত ফসফরাস (%)	০.৬৪	০.৪৭	০.৮৩	০.৬৬
লাইসিন (%)	১.০০	০.৮৫	১.০০	০.৮৫
মিথিওনিন (%)	০.৪৪	০.৩৪	০.৪৪	০.৩৬

(গ) আলোক ব্যবস্থাপনা

ব্রয়লার বাচ্চার অধিক হারে খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সার্বক্ষণিক আলো প্রদান করা প্রয়োজন। আলোক ব্যবস্থা ব্রয়লার বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সুনির্দিষ্ট আলোকব্যবস্থাপনার সাহায্যে ব্রয়লারের খাদ্য রুপান্তরের হারবৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রথম সপ্তাহে ২৪ ঘন্টা এবং ২য় সপ্তাহ থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত ২৩ ঘন্টা আলো এবং ১ ঘন্টা অন্ধকারে রাখা প্রয়োজন। প্রথম সপ্তাহে ব্রড়ার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ওয়াটের ৪টি বাল্ব ঝুলিয়ে আলো দেয়া যেতে পারে। প্রথম থেকেই প্রতি রাতে আধ ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাদের অন্ধকারের সাথে পরিচয় করানো উচিত।

(ঘ) টিকা দান কর্মসূচি

বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত যে টিকাদান কর্মসূচিটি মাঠ গবেষণার মাধ্যমে সক্ষম প্রমাণিত হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো। তবে যে সমস্ত এলাকায় ব্রয়লার খামারের সংখ্যা খুবই নিবিড় সে সমস্ত এলাকায় গামবোরো ভ্যাকসিনের স্ট্রেইনের পরিবর্তন হতে পারে।

বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	ভ্যাকসিনের ধরন	প্রয়োগের পথ	ডোজ	রোগের নাম
৭	এনডি- ক্লোন ৩০	জীবন্ত	চোখে	১ ফোঁটা	রানীক্ষেত
১৪	গামবোরো ডি-৭৮	জীবন্ত	চোখে	১ ফোঁটা	গামবোরো
২১	এনডি-৩০	জীবন্ত	চোখে	১ ফোঁটা	রানীক্ষেত
২৮	গামবোরো ডি-৭৮	জীবন্ত	চোখে	১ ফোঁটা	গামবোরো

(ঙ) ব্রয়লাস খামারে বায়োসিকিউরিটি

খামারকে রোগমুক্ত রাখতে এবং কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পেতে হলে বায়োসিকিউরিটির উপর বিশেষ গুরুত্বদিতে হবে।

১. রোগ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিকার উত্তম। সুতরাং সেদিকে নজর দিতে হবে।

২. খামারের প্রবেশ পথে জীবাণুনাশক পাত্র বা স্প্রেয়ার রাখতে হবে।

৩. খামারে ব্যবহারের জন্য আলাদাভাবে পোষাক ও জুতার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. মৃত ব্রয়লার গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়ে ফেলতে হবে।

৫. অন্যান্য মোরগ-মুরগির ঘরে যাতে পাখি, ইঁদুর, কুকুর বা বন্য বিড়াল প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. দর্শনার্থীদের খামার পরিদর্শনে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

৭. সপ্তাহে ১ দিন খামারের মাচা , বেড়া, আশপাশ জীবানুনাশক দ্বারা স্প্রে করতে হবে।

প্রতি ব্যাচ সম্পূর্ণ করার কম পক্ষে ১৫ দিন পর বাচ্চা উঠানো যাবে। বাচ্চা উঠানোর পূর্বে খামারের মাচা, বেড়া আশপাশ ভালভাবে জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

১. ৫০০ বর্গফুট ঘরের খরচ ১২০০০.০০ টাকা

২. প্রতিটি বাচ্চা ১৯.০০ টাকা

৩. ৫ সপ্তাহ বয়সে গড় ওজন ১.৫ কেজি এবং বাজার মূল্য ৬০.০০ টাকা/কেজি

৪. মৃত্যুহার ২% ধরা হয়েছে।

৫. পারিবারিক শ্রম ব্যবহারে ৫০০ ব্রয়লার পালন করা সম্ভব।

৬. বছর ৬টি ব্যাচ করা সম্ভব ৬ ব্যাচে মোট লাভ = ৬৭,৪৫২.০০ টাকা।

৫০০ ব্রয়লার পালনের হিসাব নিকাশের একটি নমূনা ঃ

উপাদান	এক ব্যাচে খরচ (টাকা)	এক ব্যাচে আয় (টাকা)
ঘর	৮৫৭.০০	
ব্রয়লার বাচ্চা	১০০০০.০০	
খাদ্য পাত্র	৫৭.০০	
পানি পাত্র	৫০.০০	
খাদ্য	১৯৫০০.০০	
ভ্যাকসিন	১০০০.০০	
ঔষধপত্র	৫০০.০০	
জীবাণুনাশক	১৫০.০০	
লিটার	১০০০.০০	
চিকগার্ড	১০০০.০০	
বিদ্যুৎ	৫০০.০০	
লিটার বিষ্ঠা (৩০ বস্তা)	-	১৫০০.০০
ব্রয়লার	-	৪২৭৫০.০০
	৩৪৬১৪.০০	৪৪২৫০.০০
প্রকৃত লাভ	৪৪২৫০.০০ - ৩৪৬১৪.০০ = ৯৬৩৬.০০	

৮। ক্ষুদ্র ঋণের সংস্থান

ব্রয়লার পালনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্রঋণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো প্রতিষ্ঠান সংগঠিত খামারিদের বাচ্চা, খাদ্য,ভ্যাকসিন এবং সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ক্ষুদ্র আয়ের ব্যবস্থা করলে খামারিরা প্রতি ব্যাচ ব্রয়লার বাজারজাতকরণের পর বাচ্চা,খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র, জীবাণুনাশক, খাবার পাত্র, পানির পাত্র ইত্যাদির মূল্য ক্রেডিট প্রদানকারী সংস্থাকে ধাপে ধাপে পরিশোধ করতে পারবে। ক্ষুদ্র ঋণের জন্য স্থানীয় ব্যাংকের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন। খামারিগণ নিজেরা আর্থিকভাবে সমর্থ হলে প্রশিক্ষণ গ্রহণপূর্বক নিজেরাই ব্রয়লার পালন করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্রয়লার পালনের উপকরণসমূহ সঠিকভাবে নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৯। খামারি সংগঠনের মাধ্যমে উপকরণ সংগ্রহ ও ব্রয়লার বাজারজাতকরন

খামারি সংগঠনের মাধ্যমে ব্রয়লার পালনের জন্য যে সমস্ত উপকরণ ক্রয় করা প্রয়োজন তা একত্রিতভাবে ক্রয় করলে আর্থিক সাশ্রয় হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, এক সাথে সবাই মিলে ব্রয়লার পালন করলে এবং পরবর্তীতে একসাথে বিক্রি করলে ফড়িয়াদের সাথে দর কষাকষি পূর্বক ন্যায্য মূল্য পেতে পারে। তাছাড়া, খামারি সমিতির মাধ্যমে ভ্যাকসিন, জীবাণুনাশক প্রভৃতি উপকরন ক্রয় করে আর্থিকভাবে সাশ্রয় করতে পারবে। বাজারজাতকরণের বিষয়ে স্থানীয় বাজারের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০। খামারিদের নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় সভা

ব্রয়লার মডেলটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পোল্ট্রি উৎপাদন সমিতি গঠন অত্যন্ত কার্যকর। সমিতির আওতাভুক্ত খামারিগণ সময় সুযোগ অনুসারে নিয়মিতভাবে সপ্তাহে বা মাসিক সভা করবে। উক্ত আলোচনা সভায় খামারিগণ মডেল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে সক্ষম হবে। খামারি সংগঠনটি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি গঠনতন্ত্র থাকা আবশ্যক। মতবিনিময় সভায় এমন কোনো সমস্যা খামারিরা নিজেরা সমাধান করতে সক্ষম না হলে প্রয়োজনে পরবর্তীতে উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করতে সক্ষম হবে।

১১। আপদকালীন আর্থিক সংস্থান

খামারি সংগঠনের আয় থেকে অথবা সদস্যদের মাসিক চাঁদা থেকে প্রাপ্ত কিংবা খামারিগণ প্রতি ব্যাচ ব্রয়লার বাজারজাত করণের পর লভ্যাংশের কিছু পরিমাণ অর্থ নিয়মিতভাবে সংগঠনের একাউন্টে জমা করলে আপদকালীন সময় খামারিরা উক্ত অর্থ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে এবং এতে খামারিরা সংকট মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

উপসংহার

উপরোক্ত ব্যবস্থা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দূরীকরণ তথা আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্রয়লার পালন নিঃসন্দেহে অগ্রণি ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ব্রয়লার পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে বিশেষ অবদান রাখা সম্ভব ।

প্যাকেজের উদ্ভাবকঃ ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, ড. নাথুরাম সরকার, ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন, মোঃ আব্দুর রশীদ, মোঃ শামীম আহমেদ, ওয়াহিদা পারভীন, ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন ও রেজিয়া খাতুন

ধানের জমিতে হাঁস পালন

উপযোগিতা

ধানের জমিতে খাদ্য সরবরাহের উপর ভিত্তি করে প্রতি একরে ২০০-৫০০ টি এবং হেক্টরে ৫০০-১২০০ টি হাঁস পালন করা যেতে পারে। হাঁস পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করে এই সংখ্যা আরও ৫০% বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

খাদ্য সরবরাহ

প্রতি হাঁসের জন্য দৈনিক খাদ্য চাহিদা ১৪০ গ্রাম। ধানের জমিতে হাঁস সহজেই তার এই চাহিদা পূরণ করতে পারে, বিশেষ করে রোপা আমন ফসলে। আগাছা, শামুক, কীটপতঙ্গ, ঝরে পড়া ধান এ সবই হাঁসের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য। জমিতে কিছু 'ডাক উইড' ছেড়ে দিয়ে আগাছা খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ধানের জমিতে চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যের ঘাটতি হলে অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। মোট খাদ্য চাহিদার ৫ ভাগের ২ ভাগ অতিরিক্ত খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করা যেতে পারে। চালের গুড়া, ভিজা চাল, গম, ভুট্টা, গম ও চালের ভুষি, ছোট শুটকি মাছের গুঁড়া এবং খৈল দিয়ে অতিরিক্ত খাদ্য তৈরী করা যায়। প্রতি হাঁসের জন্য দৈনিক ৬০ গ্রাম বা বৎসরে ২২ কেজি অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

ধানের জমিতে হাঁস চরানোর সময়

- জমি চাষ ও তৈরীর সময়। এই সময় প্রচুর পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য খাদ্য পাওয়া যায়। তবে ফসলের জন্য উপকারী পোকামাকড় দেখা গেলে রক্ষা করে অন্য জমিতে সরিয়ে দিতে হবে।
- বপনের দেড় মাস বা রোপণের দুই সপ্তাহ পর থেকে ফুল আসা পর্যন্ত । এই সময় গাছের প্রচুর পাতা পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ও শামুককে আকর্ষণ করে। তবে ফসলের জন্য উপকারী পোকামাকড় অন্য জমিতে সরিয়ে দিতে হবে।
- ধান কর্তনের পরেঃ জমিতে ঝরে পড়া ধান হাঁসকে খাওয়ানো যেতে পারে।

ধানে ফুল আসার পর থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্তজমিতে হাঁস চরানো ঠিক হবে না। এতে গাছের ক্ষতি হতে পারে এবং ফলন কমে যেতে পারে।

হাঁস চরানোর উপকারিতা

- অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ দমন করা যায়।
- জমি নিড়ানোর কাজ হয় এবং গাছের পক্ষে পুষ্টি গ্রহণ সহজ হয়।
- হাঁসের বিষ্ঠা জমিতে পুষ্টি ও জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
- কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে দেয়।

হাঁসের জাত

পশুপালন অধিদপ্তরের অনুমোদন অনুযায়ী খাকি ক্যাম্বল, বেইজিং, রানার ও জেন্ডিং জাতের হাঁস ধানের জমিতে পালনের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। এই সমস্ত জাতের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। শুধুমাত্র প্লেগ ও কলেরা ইন্জেকশন দিতে হয়।

হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তিস্থান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হাঁস-মুরগির খামার।

হাঁস পালনের উপর প্রশিক্ষণ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হাঁস-মুরগির খামার।

গরু মোটাতাজাকরণ

পটভূমি

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রিয় খাদ্য গরুর মাংস। প্রতি বছরে ৬০০X১০^{৩} মে টন গরুর মাংস উৎপাদন হয়। এর পুরোটারই উৎস গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা। বাংলাদেশে গরুর মাংস উৎপাদনের কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি খামারি পর্যায়ে নেই। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে গরুর মাংস উৎপাদনের নির্দিষ্ট জাত আছে এবং এদের বাছুরগুলো ১৮ থেকে ২৪ মাস পালন করে মাংসের জন্য বাজারজাত করা হয়। উচ্চ মূল্য সম্পন্ন ভিল (Veal) উৎপাদনের জন্য অনেক সময় ৯ মাসেও গরুগুলোকে জবাই করে বাজারজাত করা হয়। এ ধরনের মাংস উৎপাদন পদ্ধতি বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত এবং মাংস উৎপাদনের জন্য গরুর জাতও পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে বর্তমানে পশু উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিবেচনায় রেখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারে কি ভাবে লাভজনক ভাবে মাংস উৎপাদন করা যায় সে লক্ষ্যকেই সামনে রেখে গরু মোটাতাজাকরণ প্যাকেজ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ষাঁড় ও বলদ অথবা পুন:উৎপাদন ক্ষমতাহীন গাভীগুলোই এ প্রক্রিয়াতে ব্যবহার হয়ে থাকে। খাদ্যাভাবে দেশী গবাদি পশুগুলোর মাংস বা দুধ উৎপাদন আশানুরূপ নয়। ষাঁড় বা বলদগুলো কর্ষণ বা গাড়ি টানা শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং খাদ্যাভাবে দুর্বল থাকে। ফলে মাংস উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। এরূপ ষাঁড় এবং বলদগুলোকে যখন পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হয় তখন এদের অতীতের উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম সময়ে পুষিয়ে আনতে চায়। বিষয়টি প্রায় সব প্রকার জীবের জন্যই সত্য বলে বিবেচিত। অর্থাৎ কোনো জীবকে যখন কিছুদিন

অপুষ্টিতে রেখে পুষ্টিপূর্ণ খাদ্য সরবরাহ করা হয় তখন উক্ত জীব তার পূর্বের অপুষ্টিজনিত হ্রাসকৃত বৃদ্ধি পুষিয়ে নেয়। জীবের এ ধরনের বৃদ্ধিকে Compensatory Growth বলা হয়। অপুষ্ট এবং দুর্বল গরুগুলো উন্নত পুষ্টি ও খাদ্যে স্বল্প সময়ে যে শরীর বৃদ্ধিপাপ্ত হয় তা লাভজনক মাংস উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে বিএলআরআই এর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে গরু মোটাতাজাকরণ প্যাকেজ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়।

যে সমস্ত অঞ্চলে ব্যবহার যোগ্য : দেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চল।

প্রযুক্তিটির মূল বৈশিষ্ট্য

"কমপেনসেটরি গ্রোথ" ব্যবহারে দেশী অপুষ্ট গরু হতে লাভজনকভাবে মাংস উৎপাদন।

প্যাকেজ প্রযুক্তির বর্ণনা

গরু মোটাতাজাকরণ প্যাকেজ চার (৪) টি পর্ব বিশিষ্ট একটি উৎপাদন প্রযুক্তি । পর্বগুলো হচ্ছে-

১. গরু নির্বাচন

২. কৃমিমুক্তকরণ

৩. পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৪. বাজারজাতকরণ।

১। গরুর বয়স ও নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ায় পশুর বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রক্রিয়ায় সাধারণত ২ বছর হতে ৫ বছরের গরু নির্বাচন করা যেতে পারে। দৈহিক গঠন বয়সের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।বাংলাদেশে প্রাপ্ত গরুগুলো অঞ্চলভেদে গঠন আকৃতিতে এবং উৎপাদন ক্ষমতায় ভিন্ন। বিভিন্ন প্রকার গরুর একই পুষ্টি মাত্রায় এবং খাদ্য পদ্ধতিতে দৈহিক ওজন বৃদ্ধির মাত্রা ভিন্নতর। এজন্য সব প্রকার গরুকে উন্নত পুষ্টি এবং খাদ্য পদ্ধতি ব্যবহার করেও লাভজনক হারে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি হয় না। এজন্য নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো ব্যবহার করে মোটাতাজাকরণের জন্য গরু নির্বাচন করা জরুরি।

(ক) দৈহিক আকার বর্গরূপ হবে,

(খ) গায়ের চামড়া ঢিলা, শরীরের হাড়গুলো আনুপাতিকহারে মোটা, মাথাটা চওড়া,ঘাড় চওড়া এবং খাটো,

(গ) পাগুলো খাটো এবং সোজাসুজিভাবে শরীরের সাথে যুক্ত,

(ঘ) পিছনের অংশ ও পিঠ চওড়া এবং লোম খাটো ও মিলানো,

(ঙ) গরু অপুষ্ট বা দুর্বল কিন্তু রোগা নয়।

২। কৃমিমুক্ত করণ

পশুর খাদ্যনালীতে ক্ষতিকর পরজীবী বাস করে । এরা গৃহীত খাদ্যের উৎকৃষ্ট অংশ খেয়ে জীবন ধারণ ও বংশবৃদ্ধি করে। এদের কারণে পশু ঠিকমত পুষ্টি না পেয়ে দিন দিন রুগ্ন হয়ে যায়, এবং একসময় উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গরুর খাদ্যনালীতে পরজীবী সনাক্ত করে কৃমির ঔষধ ব্যবহার করা ভাল। এজন্য নিকটস্থ একজন পশু চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। পশুর ওজনের ভিত্তিতে কৃমির ঔষধ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। গরু নির্বাচনপূর্বক সংগ্রহের পর পরই পালের সব গরুকে একসাথে কৃমিমুক্ত করা উচিত। পশু ডাক্তারের নির্দেশ মতে কৃমির ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

৩। পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গরু মোটাতাজাকরণে মোট খরচের শতকরা ৭০-৮০ ভাগই খাদ্য এবং পুষ্টির সাথে জড়িত। খাদ্য খরচ হ্রাস করা না হলে গরু মোটাতাজাকরণকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা দুঃস্কর। অনেক খামারিই খাদ্যের বিষয়টি নিয়ে বিপাকে পড়েন। কারণ, বই-পুস্তকে খাদ্যের নাম বা পুষ্টিমান দেয়া থাকলেও হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও উচ্চ মূল্যে ক্রয় করতে হয়। কম খাদ্য খরচে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহের জন্য নিচের বিষয়গুলো অনুসরণীয় ঃ

(ক) স্বল্প মূল্যে সহজপ্রাপ্য খাদ্য ব্যবহারে রশদ তৈরি,

(খ) প্রাপ্ত খাদ্যগুলো প্রয়োজনমত প্রক্রিয়াজাত,

(গ) উৎপাদন মৌসুমে খাদ্য সংগ্রহের পর মজুত,

(ঘ) পশুর প্রয়োজনের ভিত্তিতে দৈনিক খাদ্যতালিকা প্রস্তুত,

(ঙ) খাদ্য সরবরাহ পদ্ধতি নির্বাচন,

(চ) খাদ্যজনিত রোগ দমনের ব্যবস্থা ।

গরু মোটাতাজাকরণে দু'ধরনের খাদ্যের সমন্বয়ে রশদ তৈরি করা হয়।

(ক) আঁশ জাতীয়,

(খ) দানাদার ।

(ক) আঁশ জাতীয়

আমাদের দেশে আঁশ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রায় ৭০.০ শতাংশই খড়। ঋতু ও অঞ্চল ভেদে দেশী এবং উন্নত সবুজ ঘাসও পাওয়া যায়। মোটাতাজাকরণে দু'ধরনের আঁশ জাতীয় খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন বা এক সাথেও ব্যবহার হতে পারে। তবে উভয় প্রকার খাদ্যই প্রক্রিয়াজাত করা প্রয়োজন।

ধানের খড় মোটাতাজাকরণে ব্যবহারের জন্য ইউএমএস প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে। উক্ত খাদ্য প্রযুক্তিটি প্রাথমিকভাবে গরু মোটাতাজাকরণে ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু পরবর্তী

গবেষণা কার্যক্রমে দেখা যায় যে, খড়ভিত্তিক উক্ত খাদ্য প্রযুক্তিটি সকল বয়সের ও উৎপাদন পদ্ধতির জন্য ব্যবহার হতে পারে। প্রযুক্তিটি বুকলেট আকারে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং বিএলআরআই হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বর্ষা মৌসমে তাজা ও ভিজা খড় ইউরিয়া মিশিয়ে সংরক্ষণের পর গরু মোটাতাজাকরণে ব্যবহার করা যায়। একত্রে উক্ত প্রযুক্তির লিখিত বুকলেটে খাদ্য পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। সংরক্ষিত খড়ের সাথে শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত চিটাগুড় ব্যবহার করলে মোটাতাজাকরণে আরও সুফল পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া দেশীয় সবুজ ঘাস বা উৎপাদিত ফডার মোটাতাজাকরণে ব্যবহার করা যায়। দানা সংগ্রহের পর তাজা ও সবুজ ভুট্টা গাছের উপরের ৩/৪ অংশ টুকরো করে সরাসরি খাওয়ানো যায়। অধিক পরিমাণে পাওয়া গেলে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি (ইতিমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে) ব্যবহার করে সাইলেজ করে মোটাতাজাকরণে ব্যবহার করা যায়।

উল্লেখিত আঁশজাতীয় খাদ্যগুলো মোটাতাজাকরণের জন্য সংগৃহীত পশুকে যথেচ্ছা পরিমাণে খাওয়াতে হবে। আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রায় সব ধরনের সবুজ ঘাসে সহজপাচ্য শক্তির উৎস আবহাওয়াগত কারণে শীত প্রধান দেশের সবুজ ঘাসের তুলনায় মোটামুটিভাবে কম থাকে। এজন্য গবেণায় দেখা যায়, প্রাপ্ত সবুজ ঘাস খাওয়ানোর সময় শতকরা ১০ ভাগ চিটাগুড় সরাসরি মিশিয়ে দিলে ষাঁড় বা বলদের দৈহিক ওজন ২০-২৫ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি পায়। এর মূলে বৈজ্ঞানিক কারণ বিদ্যমান। মূল কথা হলো গরু মোটাতাজাকরণে আমরা যদি সবুজ ঘাস ব্যবহার করি তাহলে খাওয়ানোর সময় শতকরা ১০ ভাগ চিটাগুড় ঘাসের সাথে সরাসরি মিশায়ে খাওয়াতে পারি। খামারি ভাইয়েরা ইউএমএস এবং চিটাগুড় মিশ্রিত সবুজ ঘাস ভিন্ন ভাবে খাওয়াতে পারেন। অথবা দুটো খাদ্য মিশ্রণ করেও খাওয়াতে পারেন।

সারণি ১ ঃ আঁশ জাতীয় খাদ্য প্রস্তুতের জন্য

সূত্র	খাদ্য	শুষ্ক পদার্থেরভিত্তিতে গঠন	খাদ্যের ওজনের ভিত্তিতে গঠন
ইউএমএস	খড়ঃ চিটাগুড়ঃ ইউরিয়া	৮২ ঃ ১৫ ঃ ৩	১০০ ঃ ২২-৩০ ঃ ৩
সংরক্ষিত	খড়ঃ ইউরিয়া	১০০ ঃ ৪	১০০ ঃ ২.০
তাজা ও ভেজা খড়	খড় ঃ চিটাগুড়	৯০ ঃ ১০	১০০ ঃ ৩-৫
সবুজ ঘাস	সবুজ ঘাসঃ চিটাগুড়	১০০ঃ ১০	১০০ঃ৩.০-৩.৫

(খ) দানাদার মিশ্রণ

আমাদের দেশে প্রাপ্ত দানাদার ব্যবহারে বিভিন্ন মিশ্রণ তৈরি করে আঁশ জাতীয় খাদ্যের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

দানাদার মিশ্রণ তৈরির কিছু ফরমুলা সারণি ২ এ দেয়া হলো-

সারণি ২ ঃ গর মোটাতাজাকরণে ব্যবহারযোগ্য কিছু দানাদার মিশ্রণ

খাদ্য	মিশ্রণ. ১	মিশ্রণ. ২	মিশ্রণ. ৩	মিশ্রণ. ৪	মিশ্রণ. ৫	মিশ্রণ. ৬	মিশ্রণ. ৭	মিশ্রণ. ৮
(১) শস্য (১০০০)								
চাল ভাংগা	-	২০০	-	২০০	-	-	১০০	১০০
গম ভাংগা	-	-	১৫০	-	-	-	-	১০০
ভুট্টা ভাংগা	-	-	-	-	-	১৮০	-	-
খেসারি ভাংগা	-	-	-	-	-	-	১০০	-
(২) কুঁড়া ভুসি								
গমের ভুসি	৫৪০	৩০০	২৫০	১৩০	-	২০০	১৫০	২৫০
ধানের ভুসি	-	২৩০	২৮০	২০০	৫৩০	২৩০	৩৮০	২৮০
খেসারি ভুসি	২০০	-	-	-	১৪০	১৫০	-	-
মসুর ভুসি	-	-	১০০	২৪০	১০০	-	-	-
(৩) আমিষের উৎস্য								
তিলের খৈল	১৫০	-	-	১৫০	১৫০	-	-	২০০
নারিকেলের খৈল	-	-	-	-	-	-	২০০	-
সরিষার খৈল	-	১৯০	১৪০	-	-	১৬০	-	-
মাছের গুঁড়া	৮০	৫০	৫০	৫০	-	৫০	৪০	৪০
সয়াবিন মিল	-	-	-	-	৫০	-	-	-
(৪) খনিজ								
লবণ	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
ঝিনুকের পাউডার	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
চুনাপাথরের পাউডার	-	-	-	-	-	-	-	
(৫) পুষ্টি উপাদানের মাত্রা								
শুষ্ক পদার্থ (g/Kg)	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০
মেটাবলিক শক্তি (MJ/kg DM)	১০.৭০	১১.২৬	১০.৮৮	১১.০৪	১০.৪৯	১১.০৯	১১.০৬	১১.৪৯
আমিষ (g/KgDM)	২০৯	১৮৭	১৮৩	১৮১	১৮৩	১৭৯	১৮৪	১৯৬

সারণি ২ এ গরু মোটাতাজাকরণে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি খাদ্য ফরমুলা প্রদত্ত হলো-

(ক) খড়ভিত্তিক খাদ্য ফরমুলা

১. ইউএমএস যথেচ্ছা পরিমাণ + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা .০৮-১.০ ভাগ)

২. ইউরিয়া দিয়ে সংরক্ষিত খড় + মোট খড়ের শতকরা ৩.০-৪.০ ভাগ চিটাগুড় + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.৮-১.০ ভাগ)

(খ) সবুজ ঘাসভিত্তিক খাদ্য ফরমুলা

১. সবুজ ঘাস + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.০-১.০ ভাগ)

২. সবুজ ঘাস + মোট ঘাসের শতকরা ২.৫-৩.০ ভাগ চিটাগুড় + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.৮-১.০ ভাগ)

৩. সবুজ ঘাস ঃ ইউএমএস + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.৮-১.০ ভাগ)

গরু মোটাতাজাকরণে পুষ্টিজনিত কিছু সমস্যা ও দমনের উপায়

(ক) এসিডোসিস

অনেক খামারি গরুকে প্রচুর পরিমাণে দানাদার খাদ্য, ভাত অথবা অনেক সময় চিটাগুড় সরাসরি খাইয়ে থাকেন। এ ধরনের খাদ্যগুলো একসঙ্গে বেশি পরিমাণ খাওয়ালে গরুর পেটে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়। গরুর পেট কামড়ায়, অস্বস্তিবোধ করে এবং মাত্রা বেশি হলে পেটে লাথি মারে ও শুয়ে পড়ে।

প্রতিরোধ

দানাদার মিশ্রণ কমপক্ষে দিনে দু'বারে অথবা তিনবারে ভাগ করে সরবরাহ করতে হবে। ভাত অন্যান্য দানাদার মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। তবে খরচের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। চিটাগুড় সরাসরি খাওয়ানো পরিহার করে বিভিন্ন আঁশ জাতীয় খাদ্যের সাথে ব্যবহারের প্রযুক্তি অনুসারে খাওয়ানো যায় (পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে)।

চিকিৎসা

এসিডোসিস হয়ে গেলে গরুর পুষ্টি প্রক্রিয়ায় দারুণভাবে ক্ষতি করে। গরুকে প্রচুর পরিমাণে পানি এবং এন্টাসিড যেমন ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট খাওয়াতে হবে। এ ছাড়া এ্যান্টিবায়োটিক এবং স্যালাইন মুখে খাওয়ানো যেতে পারে।

ব্লট

এ ধরনের রোগকে পেট ফুলা রোগ বলে। অন্যান্য কারণ না থাকলে সাধারণত ডাল জাতীয় ঘাস যথা- খেসারি, মাষকলাই ইত্যাদি ঘাস কচি অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে খেলে ব্লট হয়। এ ধরনের সবুজ ঘাস এককভাবে গরুকে যথেচ্ছা পরিমাণ খাওয়ানো উচিত নয়। এতে পেটফুলা রোগসহ পুষ্টিরও অপচয় হয়।

প্রতিরোধ

সবুজ ডাল জাতীয় ঘাসের সাথে কমপক্ষে ১৫ ভাগ খড় সরবরাহ করা যেতে পারে।

চিকিৎসা

ব্লট হয়ে গেলে প্যারাফিন, তিল বা তিসির তেল এবং এ্যান্টিবায়োটিক গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে। বিপজ্জনক অবস্থায় পেট ক্যানুলা ব্যবহারে ছিদ্র করে দেয়া উচিত।

খাদ্যব্যবস্থাপনার অন্যান্য কিছু বিষয়

স্বল্প মূল্যে খাদ্যব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্মরণে রাখা প্রয়োজনঃ

(ক) গরু সংগ্রহের পর হতে কমপক্ষে ৪৫-৬০ দিন গরুকে অধিক উন্নত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এতে গরু মোটাতাজাকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মোট সময় হ্রাস পাবে। শেষের দিনগুলোতে খাদ্যের পরিমাণ এবং গুণগত বৈশিষ্ট হ্রাস করে প্রথম দিনগুলোর খাদ্য খরচ পুষিয়ে নেয়া যেতে পারে।

(খ) গরুর গায়ে অধিক পরিমাণে চর্বি না করা। এতে গরু দেখতে সুন্দর লাগলেও পুষ্টির অপচয় ও খরচ বৃদ্ধি পায়। তবে বাজারের চাহিদা মতে যদি অধিক চর্বিযুক্ত গরু উৎপাদন করা প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে লাভের ভিত্তিতে গরু চর্বিযুক্ত করা যেতে পারে।

(গ) খাদ্যের অপচয় বিশেষ করে আঁশ জাতীয় খাদ্যের অপচয় রোধ করা প্রয়োজন। এজন্য সরবরাহকৃত খাদ্যগুলো কেটে কেটে টুকরো করে দিলে অপচয় হ্রাস করা সম্ভব।

(ঘ) আমাদের দেশে শীতের সময় গরু মোটাতাজাকরণের জন্য খাদ্যচাহিদা বৃদ্ধি পায়। শীতের সময়ে অবশ্যই গরুকে অতিরিক্ত শীত এবং ঠান্ডা বাতাস হতে রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় এ সময়ে গরু দুর্বল ও শুকিয়ে যেতে পারে।

৪। বাজারজাতকরণ

গরু মোটাতাজাকরণ প্যাকেজ প্রযুক্তি ৯০ থেকে ১২০ দিনের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে। কিন্তু খামারিবৃন্দ শুধুমাত্র ঈদের বাজারের উচ্চমূল্যের দিকে দৃষ্টি রেখে গরু ক্রয় করে মোটাতাজাকরণ করে থাকেন। অবশ্য ঈদের চড়া মূল্যে খামারিবৃন্দ বেশি লাভবান হয়ে থাকেন। ঈদ-উল-আযহায় জীবন্ত গরু বিক্রি করা হয়। অন্যান্য সময়ে গরু জবাই এবং মাংসের গ্রেডিং করে বাজারজাত করা যেতে পারে। কিন্তু এখনও মাংস বাজারজাতকরণের প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার আমাদের দেশে শুরু হয়নি। উক্ত প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে মোটাতাজাকরণ প্যাকেজ প্রযুক্তি আরও সমৃদ্ধ হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

জীবন্ত গরু বাজারজাতকরণে বাজারের চাহিদা একটি বড় বিষয়। এজন্য মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ায় গরু সংগ্রহের সময়ে গরুর মোট ওজন, রং এবং আকার-আকৃতি গুরুত্বপূর্ণ। বড় গরু ক্রয়ের ক্ষমতা খুব কম সংখ্যক ক্রেতার থাকে। এজন্য মাঝারি আকারের কালো বা লাল রং এর গরু নির্বাচন প্রয়োজন যা বাজারজাত করা সহজ হয় এবং মূল্যও বেশি পাওয়া যায়।

(ক) ঝুঁকির সম্ভাবনা

পশু নির্বাচন এবং খাদ্য প্রণালী সঠিক না হলে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে ।

(খ) লাভের হার

গরু মোটাতাজাকরণ প্রযুক্তি ব্যবহারে একজন খামারি প্রতিগরু হতে ২০০০.০০ থেকে ৭৫০০.০০ টাকা পর্যন্ত লাভবান হতে পারেন । তবে লাভের মাত্রা নির্ভর করে প্রযুক্তির ৪ টি পর্ব- যথা পশু নির্বাচন, কৃমিমুক্তকরণ, খাদ্যব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণের উপর ।

(গ) পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের কারণে পরিবেশের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই । বরং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অপুষ্ট গরুর রুমেন হতে মিথেন উৎপাদন প্রায় ৩০% হ্রাস পায় এবং পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।

(ঘ) উপসংহার

এ প্রযুক্তিটি ইতিমধ্যেই খামারি পর্যায়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে । দারিদ্র্যবিমোচন, আমিষ জাতীয় পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ যুবক ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি বিশেষভাবে সফলতা লাভ করেছে ।

প্যাকেজের উদ্ভাবক ঃ ড. খান শহীদুল হক

মুন্সিগঞ্জ জাতের দেশী গরু

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা ১৩৪১

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে গরু কৃষির একটি অপরিহার্য অংগ। অধিকাংশ খামারীগণ কৃষি কাজের জন্য গরু পালন করে আসছে। কৃষি কাজের পাশাপাশি গরু পরিবারের দুধ ও নগদ অর্থের যোগানদাতা হিসেবে সুপরিচিত। সাধারণত ষাঁড়গুলোকে হাল চাষে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত জীবনকালের উৎপাদন পর্যায়ের শেষে গাভী ও ষাঁড়গুলো মাংস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য বিশেষায়িত কোন গরুর জাত তৈরি হয়নি। দেশ ভাগের পূর্বে জমিদারগণ ইন্ডিয়া থেকে অধিক দুধ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জাতের গরু বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকালয়ে নিয়ে আসেন। এ সকল গরুর সাথে দেশী গরুর প্রাকৃতিকভাবে প্রজননের ফলে সংকর জাতের গরু উদ্ভব হয়। পরবর্তীতে এই সংকর জাতের গরুগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক বাছাই প্রক্রিয়ায় বশানুক্রমে বিভিন্ন জাতের সৃষ্টি হয়। মুন্সিগঞ্জ গরু হচ্ছে এমনি একটি জাত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে গরুর দুধ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সংকরায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর ফলে দেশী গরুর প্রতি খামারীদের আগ্রহ কমতে থাকে এবং সংকরায়নের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে আস্তে আস্তে মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর সংখ্যা কমতে থাকে এবং বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত।

দেশী গরুর এই জাতটির বৈশিষ্ট্যায়ন এবং উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন প্রশাসনের আর্থিক সহায়তায় ২০১৩ সাল থেকে একটি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর বিশেষ গুণাবলি

এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংকর জাতের গরুর তুলনায় অনেক বেশী বিধায় চিকিৎসা জনিত ব্যয় অনেক কম। এছাড়া দেশীয় প্রচলিত খাদ্য ও ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত দুধ ও বাচ্চা দেয়। গাভীগুলো শান্ত স্বভাবের হওয়ায় পরিবারের মহিলা সদস্যগণও এদের পালন করতে পারে।

চিত্র ১ ঃ মুন্সিগঞ্জ জাতের ষাঁড়

চিত্র ২ ঃ মুন্সিগঞ্জ জাতের গাভী

মুন্সিগঞ্জ গরুর আবাসস্থল

মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর মূল আবাসস্থল। তবে মুন্সিগঞ্জ জেলা সংলগ্ন বিভিন্ন জেলায় এদেরকে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় জরিপ চালিয়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ঐ সকল অঞ্চলের মোট গরুর মাত্র ৩.৫৯% হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ জাতের গরু। মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুগুলোর মধ্যে ১২.৭০%, ১৯.০৫% এবং ৬৮.২৫% হচ্ছে যথাক্রমে ১ বছরের নিচের বয়সের বাছুর, বাড়ন্ত গরু (১ বছর থেকে বাচ্চা দেওয়ার আগ পর্যন্ত বয়স) এবং বয়স্ক (নুন্যতম একবার বাচ্চা দিয়েছে) গরু। মাঠ পর্যায়ে বিশুদ্ধ মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর ষাঁড় বা সিমেন সহজ প্রাপ্য না হওয়ায় জাতটি বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ গরুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

এই জাতের গরুগুলো সাধারণত মধ্যম আকৃতির হয়। গরুর গায়ের লোমগুলো হালকা ধুসর (cream) থেকে সাদাটে বর্ণের হয়ে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে ষাঁড় গরুর সম্মুখ ভাগে কুজের (Hump) নিকটবর্তী স্থানে লালচে আভা দেখা যায়। এই জাতের গরুর নাকের অংশ, চোখের লোম, লেজে চুলের গোছা এবং খুর বাদামী বর্ণের হয়। শিং মধ্যম বা ছোট আকৃতির ও বাকানো এবং খাড়া ভাবে উপরের দিকে বিন্যস্ত থাকে। ষাঁড়ের গল কম্বল ও কুজ মধ্যম ধরণের এবং গাভীর তুলনায় উন্নত হয়। পুর্ণ বয়ষ্ক ষাঁড়ের দৈহিক ওজন ৩০০-৪০০ কেজি এবং গাভীর দৈহিক ওজন ২০০-২৫০ কেজি।

দুধ উৎপাদন

খামারী পর্যায়ে প্রচলিত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গাভীগুলোর গড় দৈনিক দুধ উৎপাদন হচ্ছে ৩.০০ থেকে ৪.০০ লিটার। বিএলআরআই গবেষণা খামারে গাভী প্রতি দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন হচ্ছে ৪.৫ থেকে ৫.৫ লিটার। তবে, কিছু সংখ্যক গাভী দৈনিক ৮.০ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়।

প্রজনন বৈশিষ্ট্য

বকনাগুলো ৩.০-৩.৫ বছর বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। পরবর্তীতে প্রতি ১২-১৩ মাস অন্তর অন্তর বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চা দেয়ার ৬০-৭০ দিনের মধ্যে পুনরায় গরম হয়।

চলমান গবেষণা কার্যক্রম

বর্তমানে জাতটির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য খামারী পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, জন সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রজনন সেবা, দৈহিক আকার ও ওজন বৃদ্ধিসহ যৌন প্রাপ্তির বয়স কমিয়ে আনার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও, বিএলআরআই গবেষণা খামারে মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর একটি নিউক্লিয়াস হার্ড গঠন করে দুধ উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিবিড়ভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপসংহার

মুন্সিগঞ্জ গরু বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আবহমান কাল থেকে পালিত হয়ে আসা একটি মুল্যবান দেশী জাতের গরু। এই জাতটির বৈশিষ্ট্যায়ন এবং উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

রচনায় ও সম্পাদনায়

ড. তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

এবং

ড. গৌতম কুমার দেব, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

বিএলআরআই প্রকাশনা নং-২৮৪

প্রথম সংস্করণ ১০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশকাল জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ

অর্থায়নে AFACI Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা ১৩৪১, ফোন ঃ ৭৭১৬৭০-২

ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯১৬৯৫

ই-মেইল ঃ infoblri@gmail.com

www.blri.gov.bd

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের দেশী গরু

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা ১৩৪১

ভুমিকা

বাংলাদেশে বিদ্যমান দেশী গরুর জাত সমুহের মধ্যে নর্থ বেঙ্গল গ্রে অন্যতম। এই জাতটি স্থানীয়ভাবে কাজলা গরু বা নর্থ বেঙ্গল গ্রে নামে পরিচিত। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংকর জাতের গরুর তুলনায় অনেক বেশী বিধায় চিকিৎসা জনিত ব্যয় অনেক কম। এছাড়া দেশীয় প্রচলিত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত দুধ ও বাচ্চা দেয়। গাভীগুলো শান্ত স্বভাবের হওয়ায় পরিবারের মহিলা সদস্যগণও এদের পালন করতে পারে। তাই দেশের উত্তরাঞ্চলে এই জাতের গরু দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর জনগোষ্ঠির নিকট জনপ্রিয়। এ জাতের গরুগুলো মূলতঃ জমিতে হাল চাষ ও গাড়ি টানার কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর জনগণ সাধারনত কৃষি জমির আইল, রাস্তার ধারের ঘাস, বাড়ীর খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য পরিমানে দানাদার খাদ্য দিয়ে পালন করে থাকে। দেশী গরুর এই জাতটির বৈশিষ্ট্যায়ন এবং উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন প্রশাসনের আর্থিক সহায়তায় ২০১৩ সাল থেকে একটি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুর আবাসস্থল

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এই জাতের গরু পাওয়া যায়। ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠি এই জাতটি বেশী পালন করে থাকে। উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জরিপ চালিয়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ঐ সকল অঞ্চলের মোট গরুর মাত্র ১২.০৯% হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের। মাঠ পর্যায়ে বিশুদ্ধ নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের ষাঁড় বা সিমেন সহজ প্রাপ্য না হওয়ায় জাতটি বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

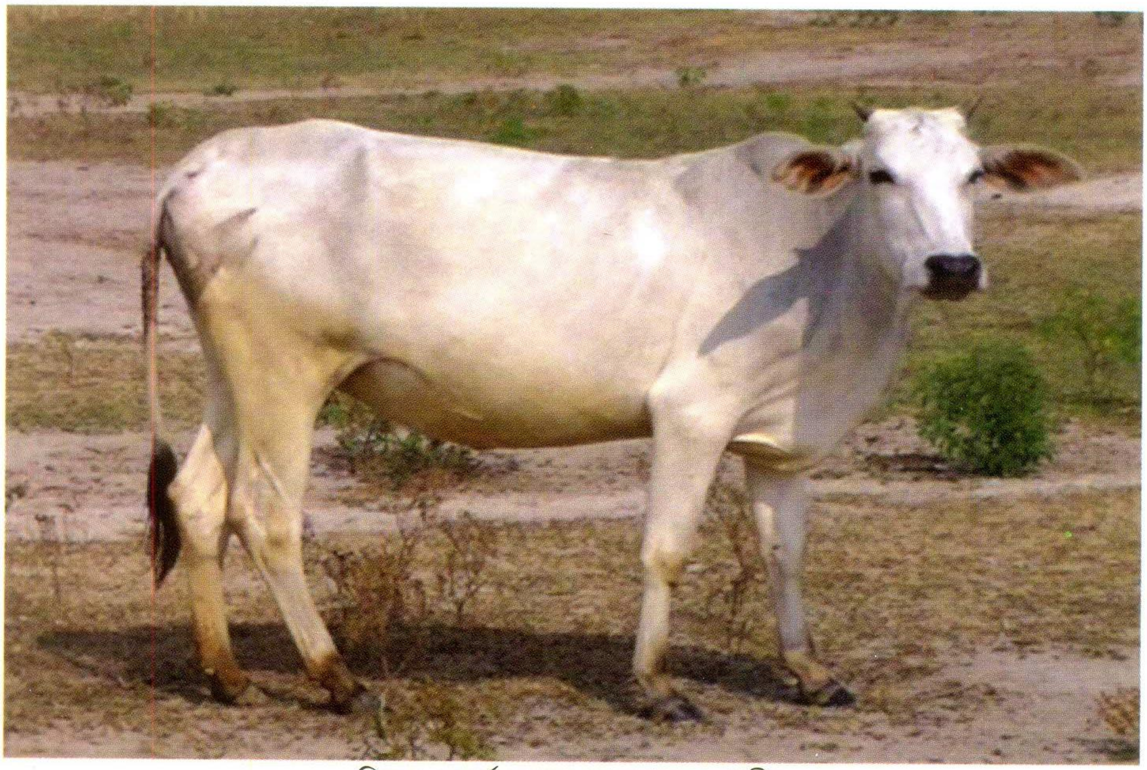

চিত্র ১ ঃ নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গাভী

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুগুলো সাধারণত মধ্যম আকৃতির হয়। প্রায় ৬৩% ক্ষেত্রে গরুর গায়ের লোমগুলো ধুসর থেকে গাঢ় ধুসর এবং ৩৭% ক্ষেত্রে হালকা ধুসর থেকে সাদাটে বর্ণের হয়ে থাকে। তবে হালকা ছাই বর্ণের নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুও পাওয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে ষাঁড় গরুর সম্মুখ ভাগে কুজের (Hump) নিকটবর্তী স্থানে কালো আভা দেখা যায়। এছাড়াও, পিঠের মেরুদন্ড বরাবর কাল আভা থাকে। এই জাতের গরুর নাকের অংশ, চোখের লোম, লেজে চুলের গোছা এবং খুর কাল বর্ণের হয়। শিং মধ্যম বা ছোট আকৃতির ও বাঁকানো এবং খাড়াভাবে উপরের দিকে বিন্যস্ত থাকে। ষাঁড়ের গলকম্বল ও কুজ মধ্যম আকৃতির এবং গাভীর তুলনায় উন্নত হয়। পুর্ণবয়স্ক ষাঁড়ের দৈহিক ওজন ৩০০-৩৫০ কেজি এবং গাভীর দৈহিক ওজন ২০০-২৫০ কেজি। তবে আদর্শ খাদ্য ও ব্যবস্থাপনায় নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুর দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার এখনও নিরুপণ করা হয় নাই।

দুধ উৎপাদন

খামারী পর্যায়ে প্রচলিত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গাভীগুলোর গড় দৈনিক দুধ উৎপাদন হচ্ছে ২.০০ থেকে ৩.০০ লিটার। তবে, গড়ে ৪-৫ লিটার পর্যন্ত দুধ দেওয়া গাভীও রয়েছে।

প্রজনন বৈশিষ্ট্য

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গাভীগুলো নিয়মিত বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চা মৃত্যুর হার তুলনামুলক ভাবে অনেক কম। বকনাগুলো ৩.৫-৪.০ বছর বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। পরবর্তীতে প্রতি ১৩-১৪ মাস অন্তর অন্তর বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চা দেয়ার ৬০-৮০ দিনের মধ্যে পুনরায় গরম হয়।

চিত্র ২ ঃ নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের ষাঁড়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশী বিধায় রোগবালাই জনিত মৃত্যুর হার কম এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুকি নেই বললেই চলে। বাছুরগুলো মাঝে মধ্যে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলেও বয়স্ক গরুর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায় না।

চলমান গবেষণা কার্যক্রম

বর্তমানে জাতটির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য খামারী পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রজনন সেবা, দৈহিক আকার ও ওজন বৃদ্ধিসহ যৌন প্রাপ্তির বয়স কমিয়ে আনার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপসংহার

নর্থ বেঙ্গল গ্রে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আবহমান কাল থেকে পালিত হয়ে আসা একটি দেশী জাতের গরু। এই জাতটির বৈশিষ্ট্যায়ন এবং উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

রচনায় ও সম্পাদনায়

ড. তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

এবং

ড. গৌতম কুমার দেব, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

বিএলআরআই প্রকাশনা নং-২৮৫

প্রথম সংস্করণ ১০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশকাল আগস্ট, ২০১৭ খ্রিঃ

অর্থায়নে AFACI Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা ১৩৪১, ফোন ঃ ৭৭১৬৭০-২
ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯১৬৯৫
ই-মেইল ঃ infoblri@gmail.com
www.blri.gov.bd

বাছুর পালন

বাছুর লালন পালনের গুরুত্ব

বাছুর উন্নয়নকে সাধারণত পালের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ আজকের বাছুর আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বাছুর লালন-পালন যদি যথাযথভাবে না করা হয় তবে ভবিষ্যৎ উৎপাদন হ্রাস পাবে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকে। পর্যায়ক্রমে উন্নত জাত এবং উৎপাদনশীল গাভী দ্বারা কম উৎপাদনশীল গাভীকে অপসারণের মাধ্যমেই উচ্চ উৎপাদনশীল পাল গঠন করা সম্ভব। তাই বাছুর লালন-পালন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

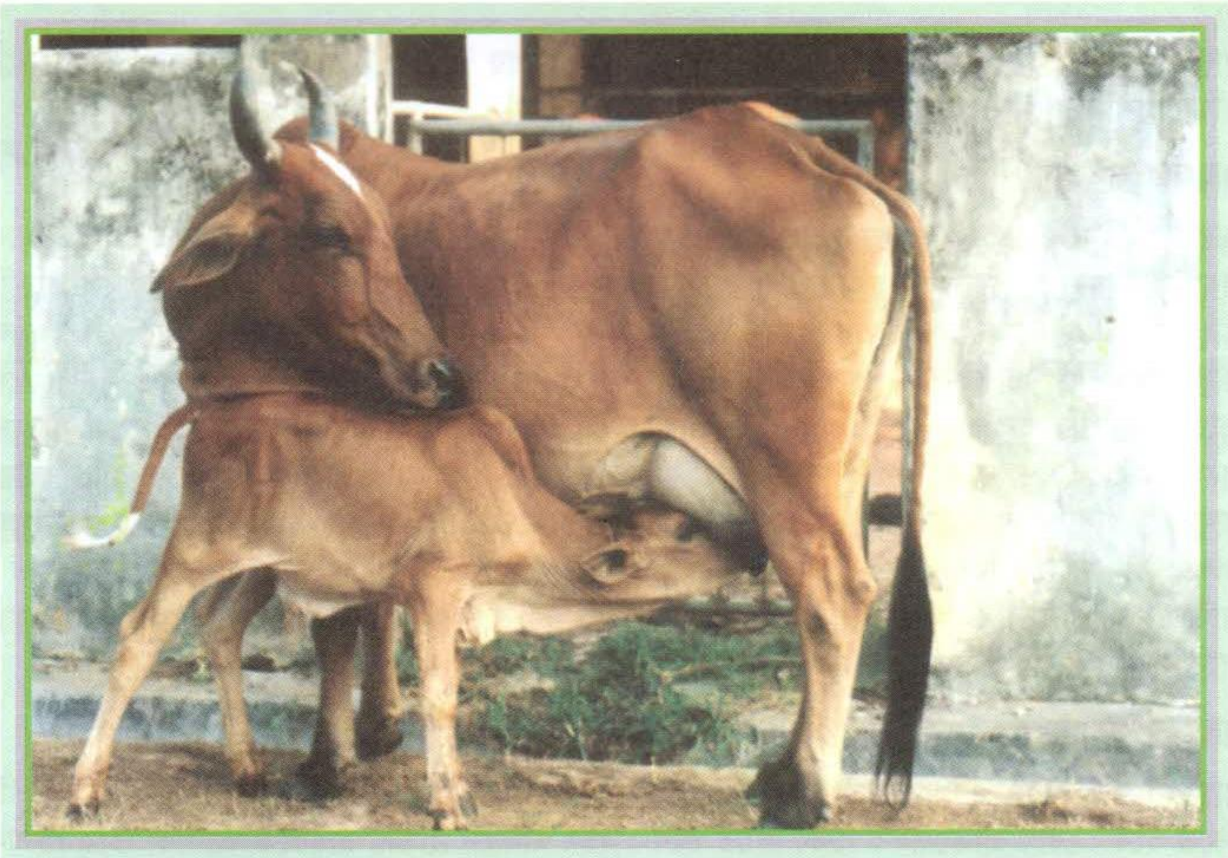

বাছুরের গর্ভকালীন যত্ন

বাছুরের গর্ভকালীন যত্ন বলতে প্রধানত মায়ের যত্নই বুঝায়। এক্ষেত্রে গর্ভবতী গাভীকে অন্তত গর্ভের শেষ তিনমাস পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে। দুধ দোহানো হলে ধীরে ধীরে শেষ তিন মাসে শুকিয়ে ফেলতে হবে। গাভীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং পরিছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। অন্য গরুর সাথে যেন মারামারি না করে তা খেয়াল রাখতে হবে। প্রসব নিকটবর্তী হলে মেটারনিটি পেন বা আলাদা স্থানে রাখতে হবে।

জন্মের প্রাক্কালে যত্ন

অবশ্যই আলাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো জায়গাতে রাখতে হবে। অপরিষ্কার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে বাছুর প্রসব করলে বাছুরের বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ ব্যতীত অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য। এ সময় শুকনো খড় বিছিয়ে দিয়ে পাশে পর্যাপ্ত খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

জন্মের পর বাছুরের যত্ন

জন্মের পর পরই বাছুরকে শুকনো খড়কুটো বা ছালার উপর রাখতে হবে। বাছুরের নাক ও মুখমন্ডল হতে লালা বা ঝিল্লি (Mucous) পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি বাছুরের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তবে বুকের পাঁজরের হাড়ে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পর পর কয়েক বার চাপ প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরের নাকে, মুখে, নাভীতে ফুঁ দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রয়োজনে শ্বাস-প্রশ্বাস বর্ধনকারী ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। জন্মের সাথে সাথে বাছুরের নাভীবোটে নাভীতে কিছু এন্টিসেপটিক যেমন টিংচার আয়োডিন, ডেটল বা সেভলন লাগাতে হবে। ফলে ধনুষ্টংকার, নাভী ফুলা, ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা থাকে না। গাভী যেন তার বাছুরকে চাটতে (লেহন) পারে সে সুযোগ দিতে হবে অথবা শুকনো খড় বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দিতে হবে। এ অবস্থায় বাছুরকে পানি দিয়ে ধৌত করা সমীচীন হবে না। কারণ পানির সংস্পর্শে আসলে বাছুরের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এবং নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বাছুর উঠে দাঁড়ালে শালদুধ খাওয়াতে হবে।

বাছুরের বাসস্থান

বাছুরের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান বাছুরকে রোগমুক্ত রাখার প্রধান সহায়ক। বাছুরকে রোগমুক্তরাখার জন্য তাদেরকে পৃথক প্রকোষ্ঠে রাখতে হবে এবং এর ফলে প্রতিটি বাছুরের রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর হয়। অনেক বাছুর একসাথে থাকলে দূর্বল বাছুরগুলো সবল বাছুরদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রয়োজনমাফিক খাবার খেতে পারে না এবং আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বাছুরের ঘর ঢালু এবং শুকনো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। বাসস্থানে আলো বাতাস সরাসরি প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা উচিত। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম ও শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডা দ্বারা বাছুরগুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঘরের মেঝেতে শুকনো খড় বা ছালার চট বিছিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি বাছুরের জন্য ৬ ইঞ্চি x ৪ ইঞ্চি মাপের ঘরের প্রয়োজন। গ্রামীণ পর্যায়ে বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে অতি সহজেই ঘর নির্মাণ করা সম্ভব। ঘরে খাদ্য ও পরিষ্কার পানি সরবরাহ করার জন্য পাত্র রাখতে হবে।

বাছুরের অন্যান্য যত্ন

বাছুরের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সময়মত খাদ্য ও পানি সরবরাহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে। বৃহৎ খামারে প্রতিটি বাছুরকে আলাদা করে চেনার জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর দিতে হবে। বাছুর বড় হওয়ার সাথে সাথে শিং কেটে ফেলাই উত্তম। না হলে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বাছুরের খাদ্য

বয়স ভেদে বাছুরের খাদ্য তিন ধরনের হতে পারে।

জন্মের পর থেকে সাত দিন

এ সময় বাছুর প্রয়োজনমত কলোস্ট্রম, কাঁচি দুধ বা শালদুধ খাবে। অন্য কোনো খাবার না দিলেও চলবে।

এক সপ্তাহ বয়স হতে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত (৫-৬ মাস বয়স)

এ সময় বাছুরকে দুধের সাথে কাফ স্টার্টার দেয়া উচিত। দুধ খেলে ভিটামিন না দিলেও চলবে। কাফ স্টার্টার না দিলে বাছুরকে পরিমাণমত উন্নতমানের আঁশ জাতীয় খাবার সরবরাহ করতে হবে। কাফ স্টার্টারে নিম্নলিখিত পুষ্টি উপাদানসমূহ থাকতে হবে।

সারণি ১ ঃ কাফ স্টার্টারের পুষ্টি উপাদান

পুষ্টি উপাদান	পরিমাণ (%)
আমিষ	১৬-১৮
আঁশ জাতীয় খাবার	৭-১০
ক্যালসিয়াম	০.৬-০.৭
ফসফরাস	০৪-০.৫
ম্যাগনেসিয়াম	০.১৫-০.২০
সোডিয়াম	০.০৭-০.০৮

দুধ ছাড়ানোর পরবর্তীকাল

ট্রানজিশন পিরিয়ড বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সময়ের মাঝামাঝি হতে বাছুরকে ক্রমে আঁশ জাতীয় খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে রপ্ত করতে হবে যাতে দুধ ছাড়ানোর পর বাছুর পুরোপুরি আঁশ জাতীয় খাদ্য নির্ভর হতে পারে। এ সময় আশঁ জাতীয় খাদ্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ দানাদার খাদ্যের মিশ্রণও সরবরাহ করতে হবে। বাছুরের এ সময়ের রসদ বাড়ন্ত গরুর অনুরূপ হবে।

বাছুরকে খাওয়ানোর পদ্ধতি

বাছুর জন্মের পরপরই বাছুরের ব্যবস্থাপনা এবং খাবার প্রণালী নিম্নরূপ হবে ঃ

১. গাভীর গর্ভধারণের ২৭৪-২৯০ দিন (গড়ে ২৮৩) দিনের মধ্যে বাছুরের জন্ম আশা করা যায়,

২. বাছুরের জন্মের পরপরই ফিটাল মেমব্রেন ও শ্লেষ্মা নাক মুখ থেকে সরিয়ে নেয়া উচিত,

৩. জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শালদুধ (কলোস্ট্রাম) খাওয়াতে হবে।

শালদুধ খাওয়ানোর নিয়ম হলো, দৈনিক প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য ১০ কেজি অর্থাৎ ২০-২৫ কেজি ওজনের বাছুরের জন্য দৈনিক ১.২-১.৫ কেজি শালদুধ খাওয়াতে হবে। অবশ্যই আধ ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টার মধ্যে এই দুধ খাওয়ানো শুরু করা উচিত। এই দুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বাছুরকে প্রথম দিন উপরোক্ত নিয়মে খাওয়ানোর পর পরবর্তী প্রায় তিন মাস পর্যন্ত নিম্নের ছকে বর্ণিত খাবারপদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

সারণি ২ ঃ জন্মের পর হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে খাওয়ানোর নিয়ম

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য দুধ	প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য দানাদার	কচি ঘাস/ইউএমএস
১-২	১০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	৮	০.৫	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	৬	১.০	প্রচুর পরিমাণ
৭-৮	৪	১.৫	প্রচুর পরিমাণ
৯-১০	২	২.০	প্রচুর পরিমাণ
১১-১২	০	২.৫	প্রচুর পরিমাণ

দুধ খাওয়ানো

সাধারণত প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য ৮ কেজি পরিমাণ দুধ খাওয়ানো উচিত। অর্থাৎ ৪০ কেজি ওজনের বাছুরের জন্য প্রায় ৩-৩.৫ কেজি দুধ খাওয়ানো উচিত। উপর্যুক্ত নিয়মানুসারে প্রায় তিন মাসের মধ্যে বাছুরকে দুধ ছাড়ানো যায়। এরপরও দুধ খাওয়ালে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ সময় বেশি দুধ খাওয়ানোতে আর্থিক অপচয় হয়। আমাদের দেশে বাছুরকে মোটামুটি ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে দুধ ছাড়ানো হয়।

বাছুরের দানাদার খাদ্য

এই দানাদার মিশ্রণ কম আঁশ যুক্ত এবং উচ্চ প্রোটিন ও উচ্চ শক্তি সম্পন্ন হতে হয়। দানাদার খাদ্যের দুটি ফরমুলা নিচে দেয়া হলো।

সারণি ৩ ঃ বাছুরের জন্য কাফ স্টার্টার (% হিসাবে)

উপাদান	১ নং	২ নং
গমের ভুসি	২৫	-
গম/চাল ভাংগা	২০	২০
মাষকলাই/খেসারি ভাংগা	২৫	২৫
তিলের খৈল	১৫	-
নারিকেলের খৈল	-	১৫
ঢেঁকিছাটা চালের কুঁড়া	-	২৫
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৭	৭
চিটাগুড়	৫	৫
লবণ	১.৫	১
ঝিনুক/হাড়ের গুঁড়া	১	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫
	১০০	১০০

কচি ঘাস অথবা ইউ এম এস

ছোট বাছুরকে কচি ঘাস, ডালজাতীয় ঘাস ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। তবে অভ্যাস করলে ইউরিয়া মোলাসেস খড় বা ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাতকৃত খড় খাওয়ানো যেতে পারে। দৈহিক ওজনের ১.৫% হারে পূর্বে উল্লেখিত দানাদার খাবারের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস বা খড় খাওয়ালে মোটামুটি ভাল ফল আশা করা যায়।

বাড়ন্ত গরুকে খাওয়ানোর পদ্ধতি

বাছুরের বয়স মোটামুটি ৬ মাস বয়সের পর থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাদের ওজনের ১% হারে দানাদার খাবারের সাথে ইউ এম এস বা সাইলেজ বা সবুজ ঘাস বা ইউরিয়া সংরক্ষিত খড় খাওয়ালে ভাল দৈহিক ওজন বৃদ্ধি আশা করা যায়।

সারণি ৪ ঃ বাড়ন্ত, বয়স্ক গরুর জন্য সম্ভাব্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (গ্রাম)

উপাদান	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২	মিশ্রণ-৩	মিশ্রণ-৪	মিশ্রণ-৫
চালের খুদ	-	২০০	-	২০০	১০০
গম ভাংগা	-	-	১৫০	-	-
খেসারি ভাংগা	-	-	-	-	২৫০
গমের ভুসি	৫৪০	৩০০	২৫০	১৫০	১৫০
চালের কুড়া	-	২৫০	৩০০	২০০	২৫০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৮-	৫০	৫০	৫০	৫০
লবণ	৫	৫	৫	৫	৫
ঝিনুকের গুঁড়া	৫	৫	৫	৫	৫
মোট	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
পুষ্টিমান এম ই (মেগাজুল প্রতি কেজি)	১০.৭১	১১.২৬	১০.৮৮	১১.০৪	১১.০৬
প্রোটিন (গ্রাম/কেজি)	২০৭	১৮৭	১৮৩	১৮১	১৮৪
দাম (টাকা/কেজি)	৭.৮৫	৭.৫৫	৭.৭৪	৭.৭০	৭.৭৭

বি এল আর আই- এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, ইউ এম এস বা ইউরিয়া সংরক্ষিত খড়ের সাথে ১.৫ কেজি গমের ভুসি এবং ১০০ গ্রাম শুটকি মাছের গুঁড়া ব্যবহার করে গরুর দৈনিক প্রায় ৭০০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে গরুকে খাওয়ানোর জন্য যে বিভিন্ন প্রকার দানাদার মিশ্রণ হতে পারে তার একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো (এক কেজিং মিশ্রণের পরিমাণ)। তাছাড়া গরুকে খাওয়ানোর জন্য যে বিভিন্ন প্রকার আঁশ জাতীয় খাবার খাওয়ানো যেতে পারে তা হলো ইউরিয়া-মোলাসেস খড় (ইউ এম এস), ইউরিয়া সংরক্ষিত খড় এবং কাঁচা ঘাস (যেমন নেপিয়ার, পারা, ভুট্টা, ওট, সরগম এবং ডাল জাতীয় ঘাস, খেসারি, মাষকলাই, ইপিল ইপিল ইত্যাদি)। এই ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়ে বা সাধারণ ঘাস ও ডাল জাতীয় ঘাস মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া কখনই ডাল জাতীয় ঘাসকে এককভাবে খাওয়ানো ঠিক নয়, অন্য ঘাস বা খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত।

৫ নং সারণিতে বিভিন্ন ঘাসের মিশ্রণ দেয়া হলো।

সারণি ৫ ঃ বিভিন্ন ধরনের ঘাসের মিশ্রণ

	উপাদান	শুষ্ক পদার্থের হার শতকরা পরিমাণ	প্রোটিন (%)	বিঃ শক্তি (MJ/কম)
মিশ্রণ-১	পারা	৬৫	১২	৮.৭
	কাউপি	২৫		
	মোলাসেস	১০		
মিশ্রণ-২	নেপিয়ার	৭০	১০	৮.২
	খেসারি	২০		
	মোলাসেস	১০		
মিশ্রণ-৩	ভুট্টা	৮০	১০	৮.৭
	খেসারি	২০		
মিশ্রণ-৪	দেশী ঘাস	৭০	৯	৮.১
	ইপিল ইপিল	২০		
	মোলাসেস	১০		

বাছুরের রোগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বাছুরকে স্বাস্থ্যবান, কার্যক্ষম, উৎপাদনমুখি রাখতে শুধু সুষম খাদ্য সরবরাহই যথেষ্ট নয়, রোগব্যাধি হতে মুক্ত রাখাও একান্ত দরকার। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে বাছুর দুর্বল, স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে, ফলে এদের দৈহিক বৃদ্ধি, কার্যক্ষমতা ও উৎপাদন হ্রাস পায় এবং মাঝে মাঝে অকাল মৃত্যুতে মালিকের তথা দেশের গো-সম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে।

বাছুরের রোগ

বাছুরের রোগ সাধারণত দুই প্রকার। সাধারণ রোগ ঃ যে সব রোগব্যাধি আক্রান্ত পশুতে সীমাবদ্ধ থাকে, সহজে অন্য পশুতে সংক্রামিত হয় না এবং তুলনামূলকভাবে প্রাণীর মৃত্যুর হার কম, তাকে সাধারণ রোগ বলে। যদিও সাধারণ রোগে মৃত্যুর হার কম, কিন্তু আক্রান্ত বাছুরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, দৈহিক শক্তি ও বৃদ্ধি কমে যায় এবং উৎপাদন হ্রাস পায়। এজন্য সাধারণ রোগকে অবহেলা না করে ত্বরিত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেয়া দরকার। আমাদের দেশে বাছুরের সচরাচর যে সব সাধারণ রোগ-বালাই দেখা যায় বা হয়, সেগুলোর প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

কাটা, পোড়া, ঘা, আঘাত ইত্যাদি

এগুলো জীবাণুঘটিত রোগ না হলেও অবহেলা করা উচিত নয়। এ রোগগুলোর কারণে বাছুরের প্রাথমিক কোনো ক্ষতি না হলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য রোগ বা রোগজীবাণুতে সহজে আক্রান্ত হতে পারে। তাছাড়া এ রোগগুলোর ফলে বাছুরের স্বাস্থ্য এবং কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। তাই এসব সামান্য অসুখকে অবহেলা না করে সময়মত প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

পেট ফাঁপা, বদ হজম ইত্যাদি

খাদ্যনালীতে কিছু আটকে গেলে অথবা কাদা বালি মিশ্রিত খাদ্য খেলে পেট ফাঁপা বা বদ হজম দেখা দিতে পারে। গ্যাসের জন্য পেট অত্যধিক ফুলে যায় ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পশু জাবর কাটাও বন্ধ করে দেয় এবং শরীরের তাপ কিছুটা বৃদ্ধি পায় (১০২°-১০৪°)। অসুখ দেখা দেয়ার সাথে সাথে খাদ্য বন্ধ রাখা দরকার এবং এ অবস্থায় পশুকে ঢালু জায়গায় রাখতে হবে যেন তার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট না হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে পারগেটিভ বা কারমিনেটিভ মিকচার খাওয়ানের ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়। প্রয়োজনবোধে অভিজ্ঞ ডাক্তারের সহায়তায় পেট ফুটো করে গ্যাস বের করে দেয়া যেতে পারে।

উদরাময়, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি

অনেক রোগের কারণে পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে, তবে অন্ত্রের রোগ এদের মধ্যে অন্যতম। ঘনঘন পাতলা পায়খানার দরুন বাছুরের মুখ শুকিয়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। জীবাণুঘটিত পাতলা পায়খানার কারণে আক্রান্ত বাছুর মারাও যেতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে বাছুরকে সালফার জাতীয় টেবলেট খাওয়ানো যেতে পারে। দুর্বলতার জন্য স্যালাইন বা গ্লুকোজ ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

কোষ্ঠ্যকাঠিন্য

বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হলে খাদ্যে অরুচি, পেট ফোলাভাব, পেটব্যথা, পায়খানা শক্ত ও পরিমাণে খুব কম ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। কোষ্ঠ্যকাঠিন্যে ক্যাস্টর ওয়েল (ভেরেন্ডার তৈল) বাওয়েল লিলি (তিষির তৈল) ১/২-২ পাউন্ড খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া লবণ, পানিসহ ম্যাগসাল্‌ফ (Magsulf), পানিসহ ম্যাগকারব (Magcurb) বা অন্যান্য পারগেটিভ মিকচার (Purgative) খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সর্দি-কাশি

অত্যধিক ঠান্ডা, বৃষ্টিতে ভেজা, প্রখর রৌদ্রে থাকা, আবহাওয়ার পরিবর্তনহেতু সর্দি-কাশি হতে পারে। তাছাড়া রোগজীবাণুতে আক্রান্ত হলেও সর্দি-কাশি হতে পারে। নাক দিয়ে পানি পড়া, মাঝে মাঝে হাঁচি বা কাশি দেয়া প্রাথমিক লক্ষণ, তবে এর সাথে শরীর ব্যথা ও জ্বর হতে পারে। সর্দি-কাশি দেখা দিলে আক্রান্ত বাছুরটিকে শুকনো আলো-বাতাস পূর্ণ ঘরে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। সালফার জাতীয় টেবলেট, সালফাডায়াজিন (Sulphadiazin), ভেসাডিন (Vesadin), ট্রিনামাইড (Trinamide), ইত্যাদি খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। কুসুম গরম সরিষার তৈল, ক্যামফর বা তারপিন লিনিমেন্ট দুই পাঁজরে মালিশ করা যেতে পারে।

উঁকুন

উঁকুন এক প্রকার বহিঃপরজীবী। আমাদের দেশে বাছুরসহ অধিকাংশ গবাদিপশু উঁকুন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। উঁকুন আক্রান্ত বাছুরের শরীরের লোম উস্‌কো খুসকো দেখায় এবং অনেক ক্ষেত্রে লোম ঝরে যায়। শরীরে চুলকানির জন্য বাছুর শরীর ঘষে বলে চামড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। উঁকুন আক্রান্ত

বাছুরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। তাই, উঁকুনের প্রতি উদাসীন না থেকে সময়মত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া ভাল। চকিৎসার জন্য নেগুভন (Neguvon), নাগাসেন্ট (Nagaseent), গ্যামাক্সিন (Gamaxin), এসানটল (Asantol), ইত্যাদি উঁকুন ধ্বংসকারী ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

আঁটালি

আঁটালি এক ধরনের বহিঃপরজীবী। বাছুর কয়েক প্রকার আঁটালি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত বাছুরের গায়ে চুলকানি হয় ফলে বাছুর অস্বাভাবিক আচরণ করে । আঁটালি রক্ত চুষে খায় তাই রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, ফলে বাছুরের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। আক্রান্ত বাছুরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ফলে বয়সের তুলনায় পশুকে অনেক ছোট দেখায়। আঁটালি বিভিন্ন রোগের জীবাণু বহন করে বলে বাছুর এ সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এবং আঁটালির আক্রমণ বেশি হলে পশুর পক্ষাঘাতে (Tick paralysis) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। উঁকুন এবং আঁটালি ধ্বংসের জন্য একই ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। কার্যকরভাবে আঁটালি এবং উঁকুন ধ্বংস করার জন্য ৫% ম্যালাথিয়ন বা অন্য কোনো কিটনাশক দ্রবণ আক্রান্ত বাছুরকে গোছল করাতে হবে। মানে রাখতে হবে কার্যকরভাবে আঁটালি ও উঁকুন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খামারের সকল গবাদিপশুকে এক সাথে চিকিৎসা দিতে হবে। একই সাথে খামার পরিষ্কার করে সকল আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে খামারে কিটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

কৃমি

জন্মের পরপরই এমনকি জন্মের আগেও বাছুর মাতৃ গর্ভে কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যে সব কৃমি দ্বারা বাছুর আক্রান্ত হয় তার মধ্যে লম্বা, গোল, কেঁচো বা সূতা কৃমি (Roundworm) চেপ্টা বা পাতা কৃমি (Fluke), ফিতা কৃমি (Tapeworm) উল্লেখযোগ্য। এগুলো আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিভিন্ন প্রকারের কৃমি পশুর পাকস্থলী ও অন্ত্রনালীতে বাস করে, আবার কোনো কোনো কৃমি কলিজা ও ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। কৃমি আক্রান্ত পশু মাঠে বা চারণভূমিতে পায়খানা করার ফলে মাঠের ঘাস দূষিত হয়। এসব দূষিত ঘাস সুস্থ গরু খেলে তারাও কৃমিতে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া অনেক কৃমি আছে যা শরীরের চর্ম ভেদ করে দেহে প্রবেশ করে। কৃমিতে আক্রান্ত বাছুর সহজে মারা না গেলেও স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে এবং দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। আক্রান্ত বাছুরকে ঠিকমত খাবার দিলেও তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয় না। বরং দিনদিন রোগা হতে থাকে। কারণ কৃমি পশুর খাবারের সারাংশে ভাগ বসায় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে। আক্রান্ত বাছুরের শরীরের লোম উসকোখুসকো দেখায়, বাছুর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দৈহিক বৃদ্ধি ও খাওয়া-দাওয়া কমে যায়। পশু ক্রমান্বয়ে হাড্ডিসার হয়ে পড়ে এবং রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। কখনো পাতলা পায়খানা আবার কখনো কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দেখা দেয়। আক্রান্ত বাছুরের শরীরে বিশেষত চোয়ালের নিচে পানি জমতে থাকে। গোল কৃমির জন্য নেমাফেক্স (Nemafex), ট্রোডেক্স (Trodex), রালনেক্স (Ralnex), নেলভার্ম (Nelverm); পাতাকৃমির জন্য বিলিভন (Bilivon), ফেসিনেক্স (Fesinex), জেনিল (Zenil); ফিতাকৃমির জন্য প্রিপিসাইড (Pripicide), ইউভিলন (Uvilon), ম্যানসলিন (Mansolin) ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গবাদি পশুর লালন-পালন ব্যবস্থায় বছরে ২ বার ক্রিমির ঔষধ খাওয়ানো ভাল।

সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ

সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগসমূহ সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ,ভাইরাস, ফাংগাস ও প্রোটোজোয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। রোগের উৎপত্তির কারণ, উপসর্গ, চিকিৎসা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা জানা থাকলে ব্যাপক মৃত্যুর হাত থেকে বাছুর সম্পদকে রক্ষা করা সহজ হতে পারে।

বাছুরের সাদা উদরাময় (Calfscour/colibacillosis)

সাধারণত ২ সপ্তাহের নিচের বয়সের বাছুরে এ রোগ দেখা যায়। কাফস্কাওয়ার হলে বাঁছুর পাতলা সাদা পায়খানা করে, এটি বাছুরের একটি মারাত্মক ব্যাধি। খারাপ ব্যবস্থাপনা ও কৃত্রিম উপায়ে বাছুরকে ঠিকমত না খাওয়ানোর কারণে এ রোগ হতে পারে। তাছাড়া শালদুধের অভাব, এক সময়ে বা অনিয়মিতভাবে অত্যধিক পরিমাণে দুধ খাওয়ানো, অথবা অত্যধিক ঠান্ডা দুধ খাওয়ানো এবং বাছুরের মায়ের রসদে সবুজ খাদ্যের স্বল্পতার কারণে এ অবস্থা হতে পারে। এ রোগের কারণ এসকারেসিয়া কলাই (E. coli) নামক জীবাণু যা সাধারণত মানুষ অথবা পশুর অন্ত্রে বাস করে।

লক্ষণ

১. বাছুর ঘন ঘন মল ত্যাগ করে,

২. চাল ধোয়া পানির মত সাদা রং এর পচা দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়,

৩. অনেক সময় মলে রক্ত দেখা যায় এবং মলদ্বারের চারদিকে পাতলা মল লেগে থাকে,

৪. প্রথম দিকে জ্বর হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নেমে যায়,

৫. খাওয়ায় অরুচি পরিলক্ষিত হয়,

৬. বাছুর আস্তে আস্তে দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং অবশেষে মারা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চব্বিশ ঘন্টার জন্য দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখতে হবে। এরপর গম অথবা ভুট্টার কুঁড়া অথবা উষ্ণ পানি দিতে হবে এবং সাথে সাথে দুধ খাওয়ানোর পরিমাণ বাড়াতে হবে। প্রতিদিন আধা লিটার পর্যন্ত কলস্ট্রাম যোগাড় করে খাওয়াতে হবে। শরীরে পানি শূন্যতা দেখা দিলে পশুকে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সালফার জাতীয় ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল বা ইনজেকশন দিতে হবে। এই রোগের প্রতিকার হিসেবে জন্মের পর বাছুরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রোগমুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং পরিমিতভাবে শালদুধ খাওয়াতে হবে।

নিউমোনিয়া (Pneumonia)

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি কারণে বাছুরের নিউমোনিয়া হতে পারে। এই রোগে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায়। কাশি হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসে অস্বাভাবিক ভাবে শব্দ হতে পারে। রোগের কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষণের তারতম্য হয়ে থাকে। নিউমোনিয়ার প্রচলিত নাম শ্বাস রোগ, পাঁজর ব্যথা।

লক্ষণ

১. ঘন ঘন নিঃশ্বাস এই রোগের প্রধান ও প্রথম লক্ষণ,

২. রোগের শেষ পর্যায়ে শ্বাস কষ্ট হয় এবং ইন্টারস্টিশিয়াল (Interstitial) নিউমোনিয়াতে শুষ্ক কাশি হয়,

৩. তীব্র রোগে জ্বর হয় এবং নাক দিয়ে সর্দি পড়ে, এবং

৪. বুকের মধ্যে গড় গড় শব্দ হয়।

চিকিৎসা

পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন বাছুরের শিরায় অথবা মাংসপেশিতে দিতে হবে এবং সেই সাথে এন্টিহিস্টামিনিক ইনজেকশন নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

সাবধানতা

শিরায় ইনজেকশনের ক্ষেত্রে ঔষধ ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে। মাংসপেশিতে ও চামড়ার নিচে ইনজেকশনের ক্ষেত্রে এক জায়গায় ১০ মিলি এর বেশি প্রয়োগ করা উচিত নয়।

বাছুরের ডিপথেরিয়া (Calf diphtheria)

ডিপথেরিয়া একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগ দুই ভাবে হতে পারে। যেমন-

(ক) বাছুরের ল্যারিংস (Larynx) আক্রান্ত হলে,

(খ) মুখ গহ্বর (Oral cavity) আক্রান্ত হলে।

সাধারণত ৩ মাসের কম বয়সের বাছুরের মুখগহবরে সংক্রমণের ফলে ডিপথেরিয়া হয়। অপরদিকে ল্যারিংসে সংক্রমণের ফলে যে ডিপথেরিয়া হয় তা সাধারণত বেশি বয়সের বাছুরেই হয়। স্ফেরোফোরাস নেক্রোফোরাস (Spherophorus necrophorus) নামক ব্যাকটেরিয়া এই রোগের কারণ।

লক্ষণ

মুখগহবর সংক্রমিত হলে-

১. জ্বর হয়,

২. মুখ দিয়ে লালা পড়ে,

৩. বাছুর দুধ খেতে পারে না,

৪. ল্যারিংস সংক্রমিত হলে মুখ দিয়ে গোংগানির মত ঘড় ঘড় শব্দ হয়,

৫. রোগের শেষ পর্যায়ে নাক দিয়ে পানি পড়ে এবং পশু জিহ্বা বের করে রাখে এবং

৬. শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং মুখ দিয়ে লালা পড়ে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

রোগ বিস্তার রোধকল্পে শক্ত (Coarse) খাবার দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সালফানিলামাইড এবং এন্টিবায়োটিক দ্বারা কার্যকর চিকিৎসা করা যেতে পারে।

ক্ষুরা রোগ (Foot and Mouth Disease)

ক্ষুরা রোগ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ যার ফলে মুখে ও পায়ে এক সাথে ঘা বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ দেশে চার ধরনের ভাইরাস (A, O, C, Asia-1) দ্বারা এরোগের সৃষ্টি হয়। এলাকাভেদে ক্ষুরা রোগের প্রচলিত নাম জ্বরা,পাতা, তাপা, ক্ষুরাপাকা, ইত্যাদি। দূষিত খাদ্য, পানি, বাতাস বা আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শের মাধ্যমে সুস্থ দেহে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ

১. প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর দেখা দেয় এবং শরীরের তাপমাত্রা ১০১°-১০৫° ফা. পর্যন্ত হতে পারে,

২. মুখ দিয়ে বিরামহীন লালা পড়ে, সময় সময় মুখে চপ চপ শব্দ হয়।

৩. জিহ্বা ও মুখের ভেতরে এবং পায়ের ক্ষুরার মাঝখানে ফোসকা পড়ে এবং ফেটে গিয়ে ঘা বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়,

৪. পায়ের ঘা বা ক্ষতে মাছি ডিম পাড়ে এবং মাছির লার্ভা বা শুককীট ঘা বা ক্ষতে অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করে,

৫. এ রোগে বাছুর মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মারা যায়।

চিকিৎসা

১. ফিটকারির গুঁড়া পানিতে মিশিয়ে ভাল করে মুখ ও পায়ের ঘা ধুয়ে দিতে হবে,

২. ট্রাইসালফার ১টি বড়ি ৩৫ কেজি ওজন মাত্রায় দিনে একবার খাওয়াতে হবে এবং পরদিন হতে অর্ধেক মাত্রায় পর পর ৩দিন খাওয়াতে হবে,

৩. আক্রান্ত বাছুরকে নরম খাবার দিতে হবে,

৪. চিকিৎসার ব্যাপারে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ

সুস্থ বাছুরকে সময়মত টিকা দিলে এ রোগ হয় না। বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের প্রতিষেধক টিকায় মোট ৩টি ভাইরাস স্ট্রেইন (A, O, Asia-1) ব্যবহার করা হয়।

ভাইরাস স্ট্রেইন এর উপর ভিত্তি করে ক্ষুরারোগের ২ ধরনের টিকা প্রস্তুত হয়। যথা ঃ

(ক)	মনোভ্যালেন্ট টিকা	ঃ	যে কোনো একটি স্ট্রেইন দ্বারা প্রস্তুত টিকা।
	প্রয়োগ মাত্রা	ঃ	বাছুরের জন্য ৩ মিলি।
(খ)	বাইভ্যালেন্ট টিকা	ঃ	যে কোনো ২টি স্ট্রেইন দ্বারা প্রস্তুত টিকা।
	প্রয়োগ মাত্রা	ঃ	বাছুরের জন্য ৬ মিলি।

টিকার প্রয়োগ বিধি

উপরোক্ত টিকাগুলো পশুর গলকম্বলের চামড়ার নিচে প্রতি ৪-৫ মাস অন্তর অন্তর দিতে হবে।

সতর্কতা

৪ মাসের কম বয়সী বাছুরে টিকা দেয়া হয় না।

টিকা সংরক্ষণ

রেফ্রিজারেটরে ২°-৮° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়।

বাদলা (Black leg বা Black quarter)

অল্প বয়স্ক পশু অর্থাৎ ৬ মাস থেকে ২ বছরের গবাদিপশু এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। বাদলা একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি যাতে মাংসের প্রদাহ ও রক্ত দুষ্টতা হয়ে থাকে। ক্লাস্ট্রিডিয়াম সোভিয়াই (Clostridium Chauvoei) নামক ব্যাকটেরিয়া এই রোগের কারণ। দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সুস্থ বাছুরের দেহে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ

১. তীব্র জ্বর অনুভূত হবে (১০৫°-১০৭° ফা.)
২. যে কোন ১ টি বা ২টি পায়ের (সম্মুখের বা পেছনের) উপরিভাগে মাংসবহুল জায়গা ফুলে ওঠে।
৩. ফুলাভাব পরে অন্যান্য দিকেও বিস্তার ঘটে। ফুলা স্থান প্রথমে গরম ও বেদনাদায়ক থাকে। পরে ঠান্ডা ও ব্যাথাহীন হয়ে পড়ে। ফুলা জায়গায় চাপ দিলে পচ পচ বা ফড়ফড় শব্দ করে যা এটাই এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
৪. কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দেখা দেয়।
৫. পশু খুঁড়িয়ে হাঁটে।
৬. আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে মারা যায়।

চিকিৎসা

যথাসময়ে সালফার ড্রাগ বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক শিরায় প্রয়োগ করলে আক্রান্ত পশুটি

ভাল হতে পারে। ফুলা স্থানে গরম ছেক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা কেটে দিলে রোগের প্রখরতা কমার সম্ভবনা থাকে।

প্রতিরোধ

সুস্থ অবস্থায় সময়মত প্রতিষেধক টিকা দেয়া দরকার।

টিকার প্রয়োগ মাত্রা

তিন মাস থেকে ৩ বছর বয়সী বাছুরকে ৫ মিলি টিকা কাঁধ বা ঘাড়ের চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়। টিকা প্রয়োগের পর স্থানটি উত্তমরূপে মালিশ করা প্রয়োজন। ছয় মাস পর পর এই টিকা প্রয়োগ করতে হয়।

সতর্কতা

টিকার বোতল খোলার পর ২৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলে এই টিকা ব্যবহার করা যাবে না।

টিকা সংরক্ষণ

রেফ্রিজারেটরে ৪°-৮° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।

গলাফুলা (Haemorrhagic septicaemia)

গলাফুলা একটি ছোঁয়াচে এবং সংক্রামক ব্যাধি। সাধারণত অতি তীব্র ও তীব্র এই দুই পর্যায়ে এ রোগ পরিলক্ষিত হয়। পাস্টুরেলা মালটোসিডা (Pasteurella multocida) এবং পাস্টুরেলা হিমোলাইটিকা (Pasteurella haemolytica) ব্যাকটেরিয়া এই রোগের প্রধান কারণ। আমাদের দেশে সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এলাকাভেদে গলাফুলা রোগের প্রচলিত নাম ব্যাঙগা, ঘটু, গলঘটু, গলবেরা, ইত্যাদি। দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সুস্থ দেহে রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

লক্ষণ

অতি তীব্র রোগে কোনো লক্ষণ ছাড়াই পশু হঠাৎ মারা যায়। তীব্র রোগে নিচের লক্ষণগুলো দেখা যায়ঃ

১. দৈহিক তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় (১০৫°-১০৭° ফা.),

২. গলা ফুলে যায় এবং ফুলা জায়গায় হাত দিলে গরম অনুভূত হয়। ফুলা ক্রমশ গলা থেকে বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে,

৩. শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং শ্বাস ত্যাগের সময় আওয়াজ হয়,

৪. জিহ্বা ফুলে যায় এবং সময় সময় মুখ হা করে ও জিহ্বা বের করে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে,

৫. অনেক সময় কাশি হয়,

৬. চোখে পিঁচুটি দেখা যায়,

৭. নাক দিয়ে ঘন সাদা শ্লেষ্মা পড়তে দেখা যায়,

৮. পানাহার বন্ধ করে দেয়,

৯. পশু ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারা যায়।

চিকিৎসা

Oxytetracyclin (long acting) 1ml/10kg body weight i/m injection এবং ৭২ ঘন্টা পর আরেকটি ইনজেকশন সমমাত্রায় মাংসে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিষেধক

সুস্থ অবস্থায় সময় মত প্রতিষেধক টিকা দেয়া উচিত।

প্রয়োগমাত্রা

পশুর গলার পার্শ্বে ঢিলা চামড়ার নিচে ১ মিলি টিকা এক বছর পর পর দিতে হয়।

সতর্কতা

কেবলমাত্র সুস্থ সবল পশুতে এই টিকা দেয়া উচিত। টিকা প্রয়োগের স্থান কয়েক দিন ফুলা থাকতে পারে এবং দেহের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

টিকা সংরক্ষণ

রেফ্রিজারেটরে ৪° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।

তড়কা (Anthrax)

তড়কা একটি অতি তীব্র (Peracute) বা তীব্র (Acute) সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু হঠাৎ মারা যায়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বা পরে নাক, মুখ, মলদ্বার ইত্যাদি দিয়ে তরল আলকাতরা রং-এর রক্ত মিশ্রিত রস নির্গত হতে থাকে। ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস (Bacillus anthrasis) নামক ব্যাকটিরিয়া এই রোগের কারণ। দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এ রোগ পশুতে বিস্তার লাভ করে।

লক্ষণ

অতি তীব্র রোগে আক্রান্ত পশু আকস্মিকভাবে মারা যায় এবং অনেক সময় লক্ষণ দেখা যায় না।

তীব্র রোগে নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়

- প্রথমে অত্যধিক জ্বর (১০৫°-১০৭°) হয়,
- শরীরে লোম দাঁড়িয়ে যায়,
- শরীর কাঁপতে থাকে,

- শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়,
- পশু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিংবা পশুকে কিছুটা উত্তেজিত দেখা যায়,
- এক সময় পশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে, খিঁচুনি হয় এবং মারা যায় ।

চিকিৎসা

সময়মত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে ।

প্রতিষেধক

সুস্থ পশুকে যথাসময়ে টিকা দেয়া দরকার ।

টিকার প্রয়োগ মাত্রা

বাছুরের গলার চামড়ার নিচে ০.৫ মিলি টিকা প্রয়োগ করতে হয় । এই টিকা এক বছর পর পর দিতে হয় ।

সতর্কতা

এই টিকা কেবল সুস্থ পশুকে দেয়া উচিত । টিকা প্রদানের স্থান কয়েক দিনের জন্য ফুলা থাকতে পারে এবং শরীরের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ।

টিকা সংরক্ষণ

টিকার বোতল রেফ্রিজারেটরে ৪°-৫° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে ।

বাছুরের স্বাস্থ্য বিধি পালন

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে Prevention is better than cure অর্থাৎ রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ যাতে না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ । বাছুরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ কয়েকটি নিয়মের প্রতি খেয়াল রাখলে ভবিষ্যতে অসুখ-বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে ।

১. জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শালদুধ (Clostrum) খাওয়াতে হবে । যেহেতু কলস্ট্রাম অধিক পরিমাণে 'এন্টিবডি' দ্বারা গঠিত সেহেতু নবজাত বাছুরের জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এই শালদুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ।

২. স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, পরিষ্কার সুষম খাদ্য, পরিষ্কার পানি, সেবা-যত্ন ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার ।

৩. বাছুরগুলোকে পৃথক পৃথক রাখা উচিত । সুস্থ বাছুরকে কোনো অবস্থাতেই রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে যেতে দেয়া যাবে না । এতে রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে ।

৪. বাছুরের শরীর নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত। শুকনো খড় দ্বারা তাদের শরীর ঘষে পরিষ্কার করে গোসল করানো প্রয়োজন।

৫. খাবার পাত্র ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত।

৬. কুকুর, বিড়াল, উঁকুন, আঁটালি, মশামাছি, পোকা-মাকড় এ সবের যেন উপদ্রব না থাকে তা খেয়াল রাখা উচিত।

৭. কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া বা অসুস্থতা দেখা দেয়ার সাথে সাথে সেটাকে আলাদা করে ত্বরিত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরিচর্যা করা উচিত।

৮. রোগে কোনো বাছুর মারা গেলে, তা মাটিতে পুঁতে রাখা বা পুড়ে ফেলা উচিত।

৯. বছরে দুবার অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভে ও শরতের শেষে নির্দিষ্ট মাত্রায় কৃমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করলে বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি ভাল হয়।

১০. যে সব রোগের প্রতিষেধক টিকা আছে, সময়মত স্থানীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সে সকল রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া দরকার।

উপসংহার

সর্বোপরি উপরিল্লেখিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাছুরকে লালন-পালন করলে সুস্থ সবল বাছুর পাওয়া সম্ভব এবং এর মাধ্যমে আমাদের দেশের পশুসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

প্যাকেজের উদ্ভাবকঃ ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, ড. এম, জে, এফ, এ, তৈমুর ও ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন

ডেইরি উৎপাদন

পটভূমি

পশু পাখি প্রকৃতির বাসিন্দা হয়ে যতদিন চরে খেয়েছে ততদিন তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সে নিজেই সংগ্রহ করেছে। মানুষ তার প্রয়োজনে যখন তাকে গৃহপালিত করেছে তখন থেকেই তার খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে মানুষকে ভাবতে হয়েছে, তৈরি করতে হয়েছে এগুলোর উপকরণ। এরপর পশুসম্পদকে যখন শিল্প হিসেবে বিবিচনায় আনা হয়েছে তখন উপকরণগুলো শুধু তৈরি নয় কত সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে উপকরণ বা কাঁচামালগুলো সংগ্রহ ও সরবরাহ করা যায় সে চিন্তায়ই উদ্ভাবিত হয়েছে পশুপুষ্টি বিজ্ঞানের। পশু-পাখি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের শতকরা ৬৫-৭০ ভাগ খরচ হয় খাদ্যের জন্য। বাকি অংশ বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য ব্যয় হয়।

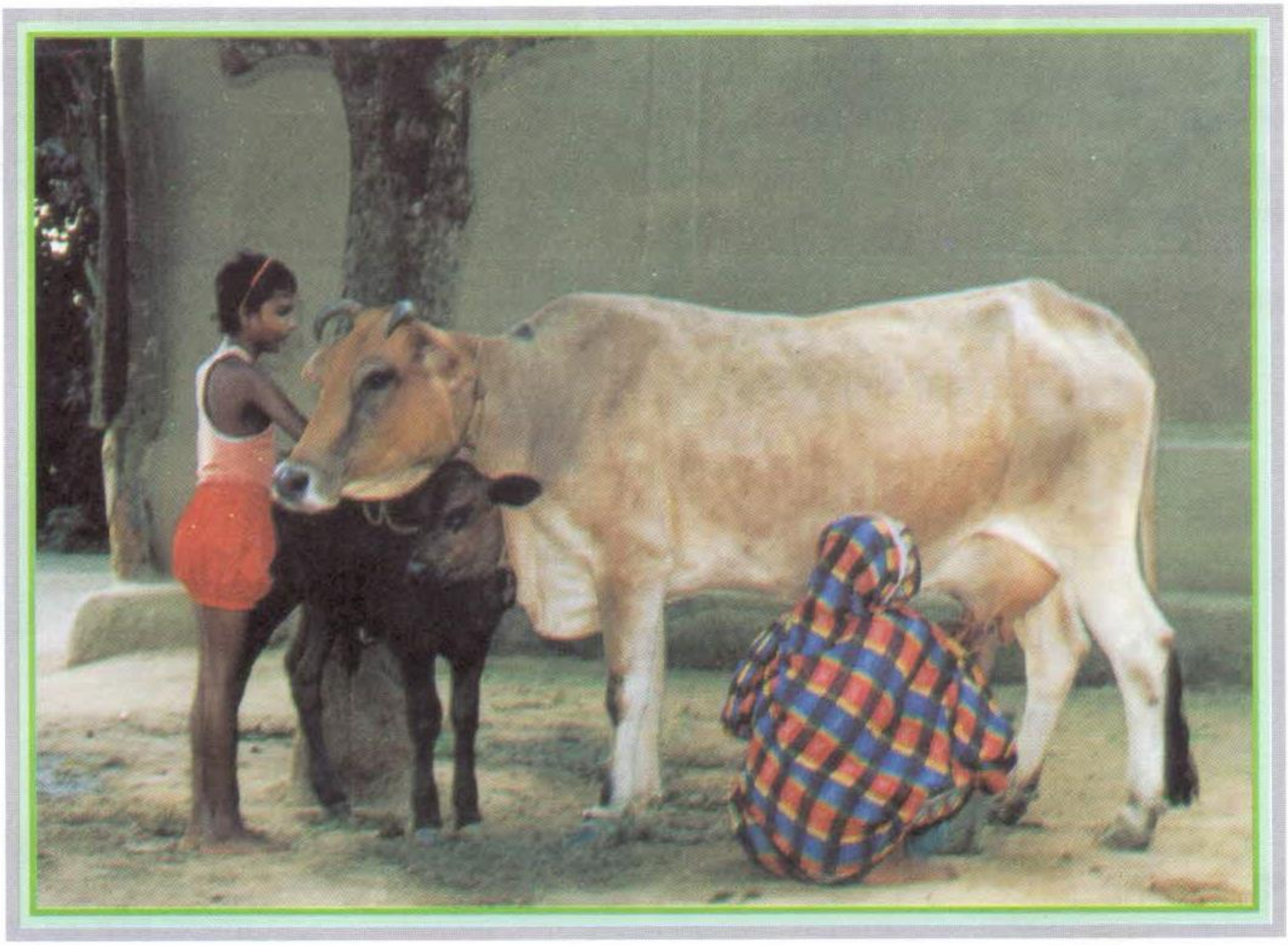

পশু-পাখি সম্পদের খাদ্য তৈরি ও সরবরাহ পশু-পাখির প্রয়োজন অনুসারে, স্বল্প মূল্যে এবং সঠিক পন্থায় না হলে এ শিল্প হতে মুনাফা অর্জন খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে পশু-পাখি একটি জীবন্ত শিল্প কারখানা যার কাঁচামাল সাধারণ খাদ্য বস্তু হলেও তা হতে যা উৎপাদন করে তা মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বা ব্যবহার্য্য বস্তু। গাভীর খাদ্য তৈরির জন্য প্রতিটি গাভীর দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে শুষ্ক পদার্থ, শক্তি ও আমিষের প্রয়োজনীয়তা জানা প্রয়োজন। এ ধরনের উপাদানের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য আমাদের দেশে কোনো ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড নেই। বিচ্ছিন্নভাবে যে হিসাবগুলো করা হচ্ছে তা কখনো মোট পাচ্য উপাদান বা Total Digestible Nutrients (TDN) এবং ডাইজেস্টবল ক্রুড প্রোটিন (Digestible Crude Protein, DCP) এর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে কখনও মেটাবলাইজেবল এ্যানার্জি (Metabolizable Energy) এবং রুমেন ডিগ্রেডেবল এবং

আনডিগ্রেডেবল প্রোটিন এর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে করা হচ্ছে। দুটো পদ্ধতিরই সুবিধা বা অসুবিধা আছে। তাছাড়া শুধুমাত্র ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে পশুর পুষ্টি সরবরাহ অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। খাদ্য সরবরাহ পদ্ধতি বা Feeding system অনুসরণও জরুরী।

আমাদের দেশে প্রাপ্ত পশুখাদ্যের বিরাট অংশ কৃষিজ উপজাত। এ সমস্ত খাদ্যের পুষ্টিমান কম। ফলে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সম্পূরক খাদ্য সংযোজন দুটোই প্রয়োজন হয়। সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারে খাদ্যের আন্তঃপ্রক্রিয়াসমূহ (feed interactions) পশুর পুষ্টি সরবরাহে তারতম্য সৃষ্টি করে। কৃষিজ উপজাতের মধ্যে খড় জাতীয় খাদ্যেই বেশি। খড় জাতীয় খাদ্যে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান পশুর রুমেনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সম্পূরক খাদ্য সংযোজন প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে আমিষ জাতীয় খাদ্যের যে অংশ রুমেনে ফারমেন্টেশন হয় তাকে রুমেন ডিগ্রেডিবল প্রোটিন বলে। রুমেন ডিগ্রেডিবল প্রোটিন রুমেন পরিবেশের জন্য এ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। এ ছাড়া খাদ্য প্রোটিনের জন্য একটি অংশ রুমেনে ফারমেন্টেশন না হয়ে খাদ্যনালীর পরবর্তী প্রকোষ্ঠসমূহে পরিপাক হয়ে উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। খাদ্য প্রোটিনের এ অংশটুকুকে রুমেন আনডিগ্রেডিবল প্রোটিন (Rumen undegradable protein, UDP) বলে। পুষ্টি উৎপাদানের এ হিসেবটি (Agricultural Research Council, U.K. (ARC) কর্তৃক অনুসরণীয়।

খাদ্য তৈরিকরণ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক ভাবনাগুলো নিম্নরূপ

- কি প্রকার পশুর জন্য খাদ্য তৈরি করতে হবে,
- নির্দিষ্ট প্রকার পশুর জন্য কতটুকু শুষ্ক পদার্থ, শক্তি বা আমিষ প্রয়োজন,
- সারা বছরে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহ এবং তাদের পুষ্টি উপাদানের মাত্রা,
- উপরোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে খাদ্য তৈরিকরণ,
- খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি নির্বাচন,
- খাদ্য খরচ নির্ণয়।

গাভীর খাদ্য

সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত একটি খামারে প্রাপ্ত গাভীর প্রকারভেদ এবং তাদের জন্য খাদ্য

- দুধালো গাভীর খাদ্য=দেহ রক্ষার জন্য + দুধ উৎপাদনের জন্য + ওজন হ্রাস/বৃদ্ধির জন্য + ৬ মাসের উর্ধ্বে গর্ভের জন্য।

খাদ্য উপাদানের প্রয়োজনীয়তা

(ক) দৈহিক শুষ্ক পদার্থের প্রয়োজনীয়তা - Dry Matter Intake (DMI)

সূত্র ঃ DMI = দৈহিক ওজন X ০.০৩ অথবা

DMI = দৈহিক ওজন X ০.০২৫ + দুধের ওজন X ০.১

শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ যদি শতকরা 'ক' হয় । তাহলে মোট ঘাস সরবরাহের পরিমাণ

$$= \frac{\text{DMI X ১০০}}{\text{ক}}$$

(খ) শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় ঃ দুধালো গাভীর যে সমস্ত কারণে শক্তি প্রয়োজন -

- দৈহিক ওজন সংরক্ষণ (MM)
- দৈহিক ওজন হ্রাস/বৃদ্ধির জন্য (Mr/Mg)
- দুধ উৎপাদনের জন্য (M2)
- গাভীর চলাফেরার জন্য

(গ) প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা

- গাভীর দেহ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টিস্যু প্রোটিন
- দুধ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় টিস্যু প্রোটিন
- দৈহিক ওজন হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন

(ঘ) খনিজের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশে গাভীর পুষ্টি সরবরাহে প্রয়োজনীয় খনিজগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সরবরাহ সবচেয়ে সমস্যাপূর্ণ । বস্তুত আমাদের দেশের প্রাপ্ত খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ফসফরাস আছে এবং সে তুলনায় ক্যালসিয়াম খুব কম থাকায় দুটি খনিজেরই ঘাটতি দেখা দেয় । ক্যালসিয়ামের অভাবে অনেক সময় অধিক উৎপাদনশীল ভাল স্বাস্থ্যের গাভী হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং জীবন বাঁচানো ঝুঁকিপূর্ণ ও খরচ বহুল হয়ে যায় । রোগটি মিল্ক ফিভার নামে পরিচিত । এ রোগটির জন্য খাদ্যের ক্যালসিয়াম ঘাটতিই মূল কারণ (খাদ্যে যদি ফসফরাসের প্রাপ্যতায় ঘাটতি থাকে তাহলে ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতেও এরোগ হতে পারে) । এজন্য গাভী গর্ভবর্তী হওয়ার ৬ মাস বয়স হতে অধিক ক্যালসিয়ামযুক্ত খাদ্য সরবরাহ অপরিহার্য । দানাদার মিশ্রণে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে নিচের পদার্থগুলো ব্যবহার করা যায় । এগুলো অন্যান্য দানাদার খাদ্যের সাথে শতকরা ৪-৬ ভাগ পর্যন্ত মিশিয়ে খাওয়াতে হবে ।

(ক) হাড়ের গুঁড়ো ঃ একটি উৎকৃষ্টমানের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের উৎস । কিন্তু উপযুক্তভাবে তৈরি না করা হলে হাড়ের গুঁড়ো হতে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । অন্যদিকে হাড়ের গুঁড়োর দামও অনেক বেশি । তবে যে সমস্ত গাভী দৈনিক ১৫ কিলোর উপরে দুধ দেয় সেগুলোকে কিছু পরিমাণ হাড়ের গুঁড়ো দেয়া যেতে পারে ।

(খ) লাইম স্টোন পাউডার ঃ এ খাদ্যটি বাংলাদেশে এখন পাওয়া যায়। ভারত ও পাকিস্তানে ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে প্রচুর পরিমাণ ব্যবহার হয়ে থাকে । লাইম স্টোন পাউডার গরুর খাদ্যে শতকরা ৪-৫ ভাগ পরিমাণ মিশেয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

(গ) ঝিনুকের পাউডার ঃ একটি সহজলভ্য ক্যালসিয়ামের উৎস্য । তবে মুরগিকে যেভাবে খাওয়ানো হয় সেভাবে গরুকে ঝিনুক খাওয়ানো যাবে না। ঝিনুককে পুরোপুরি পাউডার করে দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে গাভীকে খাওয়াতে হবে।

(ঘ) ডিমের খোসা ঃ ডিমের খোসা একটি উৎকৃষ্টমানের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের উৎস। যাদের ২/৪ টি গাভী আছে তারা নিকটবর্তী চায়ের দোকান অথবা হোটেল থেকে ডিমের খোসা সংগ্রহ করে সহজেই খাওয়াতে পারেন। এ ছাড়া হোটেলের মাংস ও মাছের কাঁটা শুকিয়ে গুঁড়ো করে গবাদিপশুর খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফরফরাসের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সবসময় ফ্রেশ ডিমের খোসা ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট ঃ এ ধরনের খনিজ বাজারে ক্যালসিয়াম ফস্ফরাসের উৎস হিসাবে পাওয়া যায় এবং গো-খাদ্যে ব্যবহার করা যায়। তবে এর দাম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

দুধের উৎপাদনভিত্তিতে দানাদার খাদ্যের হিসাব

দুধেল গাভীর জন্য মিশ্রিত দানাদার খাদ্যে শক্তি ও আমিষের ঘনত্ব প্রতি কিলো শুষ্ক পদার্থ যথাক্রমে ১১.০-১৩.০ মেগাজুল ও ১৫০-১৯০ গ্রাম থাকা প্রয়োজনীয়। গাভীকে প্রয়োজন মোতাবেক সবুজ ঘাস বা প্রক্রিয়াজাতকরণ খড় খাওয়ালে দৈনিক দুধ উৎপাদনেরভিত্তিতে দানাদার মিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে। নিচের সারণি ১ বয়সভেদে দুধ উৎপাদন (কেজি) এর ভিত্তিতে দানাদার মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তার সমীকরণ এবং ৬ মাসের উর্ধ্বে গর্ভের জন্য মোট দানাদার মিশ্রণের পরিমাণ দেয়া হলো-

সারণি ১ ঃ বিভিন্ন মাত্রার দুধ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ওজনের দুধেল ও গর্ভবতী গাভীর খাদ্যে প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্যের মাত্রা

দৈনিক ওজন(কেজি)	প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্যের সমীকরণ [C= দানাদার খাদ্য (কেজি)+ (Milk in Kg)]	দৈনিক দুধ উৎপাদন মাত্রা (Milk in Kg)	> ৬.০ মাস গর্ভের জন্য দানাদারের প্রয়োজন (কেজি)
৩০০	C= 0.5+0.7 Milk	<৫.০	১.০
৩৫০	C= 0.7+0.4 Milk	< ৮.০	১.০
৪০০	C= 2.0 +04 Milk	<১২.০	১.০-১.৫০
৪৫০	C= 3.0+0.3 Milk	<১৫.০	১৫.০-১.০-১.৫
৫০০	C= 3.0+0.3 Milk	<২০.০	১.০-১.৫

দুধালো গাভীর দৈনিক শুষ্ক পদার্থ, শক্তি ও আমিষের পরিমাণ এবং সবুজ ঘাস ও দানাদার মিশ্রণে তৈরি খাদ্য বিভিন্ন বয়স ও দুধ উৎপাদনের ভিত্তিতে ২ নং সারণিতে প্রদান করা হলো ।

সারণি ২ ঃ ওজন, দুধ উৎপাদন এবং গর্ভাবস্থার ভিত্তিতে গাভীর প্রয়োজনীয় দৈহিক পুষ্টি ও খাদ্যের পরিমাণ (আঁশজাতীয় খাদ্যে সবুজ ঘাসের হিসাবকৃত) পর্ব (এ)

গাভীর ওজন (কেজি)	দুধ উৎপাদন হার গ্রাম/দিন	প্রয়োজনীয় শক্তি			খাবার			
					আঁশজাতীয় খাবার (কেজি)		দানাদার খাবার (কেজি)	
		শুষ্ক পদার্থ (কেজি)	শক্তি (মেগাজুল)	(প্রোটিন গ্রাম/দিন	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী > ৬ মাস	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী >৬ মাস
২৫০	০.০	৭.৫০	৩১.০	৩১২	৩৪.০	৩০.০	-	১.০
২৫০	১.০	৭.৫০	৩১.০	৩১২	৩৪.০	৩০.০	-	১.০
২৫০	২.০	৭.৫০	৪২.০	৪৬১	৩০.০	৩০.০	১.০	১.০
২৫০	৩.০	৭.৫০	৪৭.০	৫৩৪	২৬.০	২৬.০	২.০	-
২৫০	৫.০	৭.৫০	৫৮.০	৬৮২	২২.০	২২.০	৩.০	-
২৫০	৫.০	৭.৫০	৫৮.০	৬৮২	২২.০	২২.০	৩.০	-
৩০০	১.০	৯.০	৩৬.০	৩৫৮	৪০.০	৩৬.০	-	-
৩০০	১.০	৯.০	৪১.০	৪৩১	৪০.০	৩৬.০	-	১.০
৩০০	২.০	৯.০	৪৭.০	৫০৬	৩৬.০	৩৬.০	১.০	১.০
৩০০	৩.০	৯.০	৫২.০	৫৮০	৩২.০	৩২.০	২.০	২.০
৩০০	৪.০	৯.০	৫৭.০	৬৫৩	২৮.০	৩২.০	২.০	-
৩০০	৫.০	৯.০	৩৬.০	৭২৮	২৮.০	৩২.০	৩.০	-
৩৫০	০.০	১০.৫	৪০.০	৪০০	৪০.০	৩৬.০	১.০	২.০
৩৫০	১.০	১০.৫	৪৫.০	৪৭৪	৪০.০	৩৬.০	১.০	২.০
৩৫০	২.০	১০.৫	৫১.০	৫৪৯	৪০.০	৩৬.০	১.০	২.০
৩৫০	৩.০	১০.৫	৫৬.০	৬২২	৩৬.০	৩২.০	২.০	৩.০
৩৫০	৪.০	১০.৫	৬১.০	৬৯৫	৩৬.০	৩০.	২.০	৪.০
৩৫০	৫.০	১০.৫	৬৮.০	৭৭২	৩৪.০	৩০.	৩.০	৪.০
৩৫০	৬.০	১০.৫	৭২.০	৮৪৪	৩৪.০		৩.০	-
৩৫০	৭.০	১০.৫	৭৭.০	৯১৭	৩২.০	-	৪.০	-
৩৫০	৮.০	১০.৫	৮৩.০	৯৯২	৩২.০	-	৪.০	-
৪০০	০.০	১২.০	৪৫.০	৪৪৪	৪০.০	৩৬.০	২	৪.০
৪০০	১.০	১২.০	৫০.০	৫১৮	৪০.০	৩৬.০	২	৪.০
৪০০	২.০	১২.০	৫৬.০	৫৯৩	৪০.০	৩৬.০	২.০	৪.০
৪০০	৩.০	১২.০	৬১.০	৬৬৬	৪০.০	৩৬.০	৩.০	৪.০
৪০০	৪.০	১২.০	৬৬.০	৭৩৯	৪০.০	৩৪.০	৪.০	৫.০
৪০০	৫.০	১২.০	৭২.০	৮১৪	৪০.০	৩৪.০	৪.০	৫.০
৪০০	৬.০	১২.০	৭৭.০	৮৮৭	৩৪.০	৩৪.০	৫.০	৫.০
৪০০	৭.০	১২.০	৮২.০	৯৬১	৩৪.০	-	৫.০	-
৪০০	৮.০	১২.০	৮৮.০	১০৩৬	৩৪.০	-	৫.০	-
৪০০	৯.০	১২.০	৯৩.০	১১১০	৩৪.০	-	৫.০	-
৪০০	১০.০	১২.০	৯৮.০	১১৮৩	৩০.০	-	৬.০	-
৪০০	১১.০	১২.০	১০৩.০	১২৫৭	৩০.০	-	৬.০	-
৪০০	১২.০	১২.০	১০৯.০	১৩৩২	৩০.০	-	৬.০	-

(চলমান)

সারণি ২ ঃ ওজন, দুধ উৎপাদন এবং গর্ভাবস্থার ভিত্তিতে গাভীর প্রয়োজনীয় দৈহিক পুষ্টি ও খাদ্যের পরিমাণ (আঁশজাতীয় খাদ্যে সবুজ ঘাসের হিসাবকৃত) পর্ব (বি)

গাভীর ওজন (কেজি)	দুধ উৎপাদন হার গ্রাম/দিন	প্রয়োজনীয় শক্তি			খাবার			
					আঁশজাতীয় খাবার (কেজি)		দানাদার খাবার (কেজি)	
		শুষ্ক পদার্থ (কেজি)	শক্তি (মেগাজুল)	(প্রোটিন গ্রাম/দিন	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী > ৬ মাস	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী >৬ মাস
৪৫০	০.০	১২.০	৪৯.০	৪৮৫	৪০.০	৩৬.০	২.০	৩.০
৪৫০	১.০	১২.০	৫৪.০	৫৫৮	৪০.০	৩৬.০	২.০	৩.০
৪৫০	২.০	১২.০	৬০.০	৬৩৩	৪০.০	৩৬.০	২.০	৩.০
৪৫০	৩.০	১২.০	৬৫.০	৭০৭	৪০.০	৩৪.০	৩.০	৪.০
৪৫০	৪.০	১২.০	৭১.০	৭৮২	৪০.০	৩৪.০	৩.০	৪.০
৪৫০	৫.০	১২.০	৭৬.০	৮৫৬	৩৬.০	৩২.০	৪.০	৫.০
৪৫০	৬.০	১২.০	৮১.০	৯২৯	৩৬.০	৩২.০	৪.০	৫.০
৪৫০	৭.০	১২.০	৮৭.০	১০০৪	৩৪.০	-	৫.০	-
৪৫০	৮.০	১২.০	৯২.০	১০৭৭	৩৪.০	-	৫.০	-
৪৫০	৯.০	১২.০	১২.২	৯৭.০	১১৫০	৩০.০	-	৬.০
৪৫০	১০.০	১২.২	১০৩.০	১২২৫	৩০.০	-	৬.০	৩.০
৪৫০	১১.০	১২.২	১০৮.০	১২৯৯	৩৪.০		৭.০	
৪৫০	১২.০	১২.৫	১১৩.০	১৩৭২	৩৪.০		৭.০	
৪৫০	১৩.০	১২.৫	১১৯.০	১৪৪৭	৩৪.০		৭.০	
৪৫০	১৪.০	১৩.০	১২৪.০	১৫২১	৩৪.০		৭.০	
৪৫০	১৫.০	১৩.০	১২১৯.০	১৫৯৮	৩৪.০		৭.০	
৫০০	০.০	১৩.০	৫৪.০	৫২৫	৪৫.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	১.০	১৩.০	৫৯.০	৫৯৮	৪৫.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	২.০	১৩.০	৬৫.০	৬৭৩	৪৫.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	৩.০	১৩.০	৭০.০	৭৪৭	৪৫.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	৪.০	১৩.০	৭৫.০	৮২২	৪৫.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	৫.০	১৩.০	৮১.০	৮৯৬	৪০.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	৬.০	১৩.০	৮৬.০	৯৬৯	৪০.০	৪০.০	৪.০	৪.০
৫০০	৭.০	১৩.০	৯১.০	১০৪৪		৪০.০	৪.০	৪.০
৫০০	৮.০	১৩.০	৯৭.০	১১১৭		৪০.০	৫.০	৫.০
৫০০	৯.০	১৩.০	১০২.০	১১৯০		৪০.০	৫.০	৫.০
৫০০	১০.০	১৪.০	১০৭.০	১২৬৫		-	৫.০	-
৫০০	১১.০	১৪.০	১১৩.০	১৩৩৯		-	৫.০	
৫০০	১২.০	১৪.০	১১৮.০	১৪১২		-	৫.০	-
৫০০	১৩.০	১৪.০	১২৩.০	১৪৮৭		-	৬.০	-
৫০০	১৪.০	১৪.০	১২৯.০	১৫৬১		-	৬.০	-
৫০০	১৫.০	১৪.০	১৩৪.০	১৬৩৪		-	৭.০	-
৫০০	১৬.০	১৪.০	১৩৯.০	১৭০৩		-	৭.০	-
৫০০	১৭.০	১৪.০	১৩৪.০	১৭৮৩		-	৮.০	-
৫০০	১৮.০	১৫.০	১৫০.০	১৮৬৫		-	৮.০	-
৫০০	১৯.০	১৫.০	১৫৬.০	১৯৩১		-	৮.০	-
৫০০	২০.০	১৫.০	১৬১.০	২০০৫		-	৮.০	-

বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাদ্য সরবরাহের ভিত্তিতে বাছুরের বয়সকালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) ক্লোস্ট্রাম ফিডিং পিরিয়ড

বাছুর প্রয়োজনমাফিক ক্লোস্ট্রাম খাবে। অন্য কেনো খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা নেই। এ সময় জন্ম থেকে ৭ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

(খ) সাকলিং পিরিয়ড

- আমাদের দেশে এ সময়কাল সাধারণত ১৮০ দিন বাছুরের বয়স পর্যন্ত ধরা যেতে পারে,
- মায়ের সাথে থেকে পরিমাণ মত দুধ খাবে,
- কাফ স্টার্টার (শতকরা ১৬-১৮ ভাগ আমিষ, ৭.১০ ভাগ আঁশ, ০.৬-০৭ ভাগ ক্যালসিয়াম ০.৪-০৫ ভাগ ফসফরাস, ০.১৫-০.২০ভাগ ম্যাগনেসিয়াম এবং ০.০৭-০.০৮ ভাগ সোডিয়াম থাকা আবশ্যক) খেতে দিতে হবে,
- পরিমাণ মত উন্নত মানের ঘাস সরবরাহ করতে হবে।

(গ) পোস্ট উইনিং পিরিয়ড

- তিন মাস বয়স হতেই বাছুরকে আঁশ জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত করতে হবে।
- নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্নতমানের দানাদার মিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে।
- আস্তে আস্তে বাড়ন্ত গরুর খাদ্যে রূপান্তর করতে হবে।

সারণি ৩ ঃ বাছুরের তিন মাস বয়স পর্যন্ত খাদ্য তালিকা

বয়স	দুধ (কিলো)	স্কিম মিল্ক(কেজি)	কাফ-স্টার্টার (গ্রাম)	কঁচিঘাস/হে (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ
প্রথম তিন দিন	২.৫০ (কলোস্ট্রাম)	-	-	-	৩ বার
৪র্থ-৭ম দিন	২.৫০	-	-	-	৩বার
২য় সপ্তাহ	৩.০০	-	৫০	২৫০	২ বার
৩য় সপ্তাহ	২.২৫	-	১০০	৩৫০	২বার
৪র্থ সপ্তাহ	৩.০০	-	৩০০	৫০০	২ বার
৫ম সপ্তাহ	১.৫০	১.০০	৪০০	৫০০	২বার
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	-	২.৫০	৬০০	৬০০	২ বার
৭ম সপ্তাহ	-	২.০০	৭০০	৭০০	২বার
৮ম সপ্তাহ	-	১.৭৫	৮০০	৮০০	২ বার
৯ম সপ্তাহ	-	১.২৫	১০০০	১০০০	২বার
১০ সপ্তাহ	-	-	১২০০	১১০০	২ বার
১১ শ সপ্তাহ	-	-	১৩০০	১২০০	২বার
১২শ সপ্তাহ	-	-	১৪০০	১৪০০	২ বার
১৩ শ সপ্তাহ	-	-	১৭০০	১৯০০	২বার

দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে দুধ সরবরাহ

- প্রথম তিন সপ্তাহ দৈহিক ওজনের ১/১০ অংশ,
- পরবর্তী দুই সপ্তাহ দৈহিক ওজনের ১/১৫ অংশ,
- পঞ্চম সপ্তাহের পর দৈহিক ওজনের ১/২০ অংশ,

অতিরিক্ত দুধ সরবরাহ করা হলে বাছুরের পেট খারাপ হয় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় সজাগ দৃষ্টি না রাখলে বাছুর অন্যান্য জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে।

- দুধ অথবা কাফ-স্টার্টারের সাথে মিশিয়ে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে,
- খনিজ ব্লক সর্বদা চেটে খাওয়ার জন্য বাছুরের নিকট রাখা যেতে পারে,
- জন্ম থেকে এক বছর পর্যন্ত বাছুরের খওয়ানোর নিয়ম ও পরিমাণ ৩, ৪ এবং ৫ নং সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ৪ ঃ কাফ-স্টার্টারের মিশ্রণ

খাদ্য উপাদান	স্টার্টার নং (শতকরা অংশ)			
	১	২	৩	৪
গম/ভুট্টা ভাংগা	২০.০	৩০.০	৪৭.০	২৫.০
খেসারি ভাংগা	২০.০	-	-	১৫.০
গমের ভুসি	-	৩০.০	১০.০	২০.০
তিলের খৈল	৩০.০	২০.০	২০.০	১২.০
ফিসমিল	৭.৭৫	-	-	১০.০
স্কিম মিল্ক পাউডার	২০.০	১৭.০	২০.০	১৫.৫
লবণ	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫
খনিজ (বাজার হতে ক্রয়কৃত)	২.০	২.০	২.০	২.০
এ্যান্টিবায়োটিক	২.০	২.০	২.০	২.০
ভিটামিন	০.০১	০.০১	০.০১	০.০১

খামারি পর্যায়ের সমস্যা

খামারি পর্যায়ে যতদিন গাভীর দুধ পর্যাপ্ত থাকে ততদিন খামারির ইচ্ছায় অথবা গাভীর কারচুপির জন্য বাছুর প্রয়োজন মাফিক দুধ পায়। গাভীর দুধ উৎপাদন সাধারণত ৬ মাসের পর কমে যায় এবং খামারিও বাছুরের দুধ পান সীমিত করে দেয়। কিন্তু এ বয়সে বাছুরের উন্নত মানের আঁশ জাতীয় ও দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হলেও খামারি খেয়াল করেন না । বাছুর যে সমস্ত খাদ্য পায় তার মধ্যে অন্যতম থাকে খড়জাতীয় নিম্নমানের খাদ্য। ফলে বাছুর আস্তে আস্তে অপুষ্টিতে ভুগতে শুরু করে।

দুগ্ধ খামার পর্যায়ের সমস্যা

খামারে এক সাথে অনেক বাছুর রাখা হয় এবং দুধ উৎপাদনকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোনো খেকে দেখা হয়। ফলে প্রায়ই বাছুরের দুধ সরবরাহ হ্রাস পায়, অন্যদিকে অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর দুধ হাতে দোহানের ফলে বাছুর প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধও পান করে। ফলে বাছুরের অনেক সময় পেট খারাপ হয়। এতে আক্রান্ত বাছুরটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। একটি বাছুর অসুস্থ হলে অন্যগুলো অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুর নানান রোগে ভুগে। এরপর খামার পর্যায়ের ভাল ব্যবস্থাপনার কারণে বাছুরের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বাছুরের খাদ্যব্যবস্থাপনা নিম্নে দেয়া হলো।

সারণি ৫ ঃ বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাছুরের খাদ্য পরিবেশন

বাছুরের বয়স (সপ্তাহ)	পরিবেশযোগ্য খাদ্য উপাদান
১৩-১৬	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। একই সাথে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম দানাদার ও ১.০ কিলো সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে ।
১৭-২০	দুধ পান দিনে দু'বার ।একই সাথে মাথাপিছু ৭৫০ গ্রাম ও ৩.০ কিলো সবুজ ঘাস দিতে হবে ।
২১-২৪	দুধ পান দিনে দু'বার ।একই সাথে ১.০ কিলো দানাদার খাদ্য ও ৫.০-৭.০ কিলো সবুজ ঘাস দিতে হবে ।
২৫-৩৫	দুধ পান বন্ধ করতে হবে । কিন্তু ১.০-১.৫ কিলো দানাদার খাদ্য ৫.০-৭.০ কিলো সবুজ ঘাস ও কিছু খড় দিতে হবে।
৩৬-৫০	১.৫-২.০ কিলো দানাদার খাদ্য ১০.০-১২.০ কিলো সবুজ ঘাস ও ১.০-২.০ কিলো খড় দিতে হবে।

বাছুরের ৬ মাস বয়সের পর থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাদের ওজনের ১% হারে দানাদার খাবারের সাথে ইউ এম এস অথবা সাইলেজ বা সবুজ ঘাস বা ইউরিয়া দ্বারা সংরক্ষিত খড় খাওয়ালে ভাল দৈহিক ওজন বৃদ্ধি আশা করা যায়। এ সময়ে গরুকে খাওয়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার দানাদার মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া গরুকে খওয়ানোর জন্য যে বিভিন্ন প্রকার আঁশ জাতীয় খাবার খাওয়ানো যায় তা হলো ইউরিয়া-মোলাসেস খড় (ইউ এম এস), ইউরিয়া সংরক্ষিত খড় এবং কাঁচা ঘাস (যেমন, নেপিয়ার,পারা, ভুট্টা, ওট, সরগম এবং ডাল জাতীয় ঘাস, খেসারি, মাষকলাই, ইপিল-ইপিল, ইত্যাদি)। ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়ে বা অডাল ও ডাল জাতীয় ঘাস মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

এগুলোর একটি তালিকা ৬ নং সারণিতে দেয়া হলো-

সারণি ৬ ঃ বাড়ন্ত/বয়স্ক গরুর জন্য সম্ভাব্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (গ্রাম/কিলোগ্রাম)।

উপাদান	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২	মিশ্রণ-৩	মিশ্রণ-৪	মিশ্রণ-৫
চালের খুদ	-	-	-	২০০	১০০
গম ভাঙ্গা	-	১৫০	১৫০	-	-
খেসারি ভাঙ্গা	-	-	-	-	২২০
গম ভুসি	৫৪০	২৩০	২৩০	১৫০	১৫০
চালের কুঁড়া	-	৩০০	৩০০	১৮০	২৫০
খেসারির ভুসি	২০০	১০০	১০০	-	-
মসুরের ভুসি	-	-	-	২৪০	-
তিলের খৈল	১৫০	-	-	১৫০	-
নারিকেলের খৈল	-	-	-	-	২০০
সরিষার খৈল	-	১৪০	১৪০	-	-
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৮০	৫০	৫০	৫০	৫০
লবণ	৫	৫	৫	৫	৫
ঝিনুকের গুঁড়া	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
মোট	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
পুষ্টিমান এম ই (মেগাজুল প্রতি কেজি)	১০.৭১	১১.২৬	১০.৮৮	১১.০৪	১১.০৬
প্রোটিন (গ্রাম/কেজি)	২০৭	১৮৭	১৮৩	১৮১	১৮৪
দাম(টাকা/কেজি)	৭.৮৫	৭.৫৫	৭.৭৪	৭.৭০	৭.৭৭

ছাগল পালন

ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে দেশে পোল্ট্রি এবং মৎস্য উৎপাদন দ্রুত বাড়লেও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে পশুসম্পদ বিশেষ করে ছাগলের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। এদেশে প্রাপ্ত প্রায় ১৫ মিলিয়ন ছাগলের প্রায় ৭৬%পালন করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের খামারিরা। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস যেমন সুস্বাদু, চামড়া তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে উন্নতমানের বলে স্বীকৃত। তাছাড়া ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং তারা দেশীয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রধানত মাংস ও চামড়া উৎপাদনকারী জাত হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। এদের গড় ওজন (১৫-২০ কেজি) ও দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার (২০-৪০ গ্রাম/দিন) বিশ্বের অন্যান্য স্বীকৃত মাংস উৎপাদনকারী জাত যেমন ঃ বোয়ের, সুদানিজ ডেসারট, বারবারি ইত্যাদির চেয়ে অনেক কম। তবে এদের বছর অনুযায়ী বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য বিদেশী জাতের ছা-গলের তুলনায় অনেক বেশি বলে সার্বিক মাংস উৎপাদনের পরিমাণও বেশি। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দুধের উৎপাদন বাচ্চার চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বাচ্চা মৃত্যুর হার বেশি। তবে গর্ভবতী ছাগলের পর্যাপ্ত পুষ্টিসহ স্বাস্থ্য ও প্রজনন ব্যবস্থাপনা এই সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ছাগল পালনের মাধ্যমে একজন ভূমিহীন বা প্রান্তিক খামারি কিভাবে বাড়তি আয় করতে পারেন এলক্ষ্যেই মডেলটি উদ্ভাবিত।

মডেলের ধরন ঃ ছাগল পালন মডেলটি ১ নং লেখচিত্রে দেখানো হলো। এখানে খামারিকে একবার/দুইবার বাচ্চা দিয়েছে এরূপ দুইটি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী ধারে সরবরাহ করতে হবে।

সেই সাথে খামারিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে। পরবর্তী ১-২ বছরে কিস্তিতে উক্ত মূল্য শোধ করতে হবে। তবে ছাগলের মৃত্যুজনিত কারণ এসময়ের পরিবর্ধন করা যাবে। তাছাড়া প্রযুক্তিগত সহায়তা খামারিগণকে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করতে হবে। একটি এলাকায় ১০-১৫টি মডেল খামারির জন্য ২টি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা ধারে সরবরাহ করা হবে যার দায়িত্বে থাকবেন একজন খামারি। তিনি সরবরাহকৃত পাঁঠার সাহায্যে মডেল খামারিদের ছাগীসহ অন্যান্য ছাগীর প্রজনন করাবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি সার্ভিসের জন্য ২৫ টাকা ফি নির্ধারণ করা হবে। প্রাপ্ত ফি থেকে উক্ত খামারি পাঁঠার মূল্য পরিশোধসহ পাঁঠার রক্ষণাবেক্ষণের অন্যান্য ব্যয় মেটাবেন। খামারিগণ তাদের খামারের আয়তন ১০-১২টি ছাগলের মধ্যে রাখবেন। এজন্য তারা খাসীকৃত ছাগলকে ৮-১২ মাসের মধ্যে এবং পাঁঠী বাচ্চাকে ৬ মাসের মধ্যে বিক্রি করবেন। এতে একজন খামারি বছরে দুইটি ছাগী থেকে গড়ে ৪টি খাসী ও ৩টি পাঠী বিক্রি করতে পারবেন।

খামারি নির্বাচন

একটি এলাকায় ১০-১৫ খামারি নিম্নোক্ত যোগ্যতায় বাছাই করা হবে।

১. খামারি ভূমিহীন/প্রান্তিক হবেন,

২. দুঃস্থ মহিলা/বেকার যুবকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে,

৩. ছাগল পালনে আগ্রহী ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে,

৪. এমন খামারি নির্বাচন করা যিনি খামারে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করতে এবং দেয় শর্তসমূহ মেনে চলতে আগ্রহী।

খামারি প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত খামারিদের ছাগল পালনের প্রযুক্তিগত দিক যেমন- আবাসন, খাদ্য/পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও প্রজনন সম্পর্কে ১-৩ দিনের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

ঘর

ছাগল সাধারণত পরিষ্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলকারী পরিবেশ পছন্দ করে। গোবরযুক্ত, স্যাঁতস্যাঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের রোগবালাই যেমন- নিউমোনিয়া, একথাইমা,চর্মরোগ, ডায়রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সংক্রামক ও পরজীবী রোগ হতে পারে। সেই সাথে ওজন বৃদ্ধির হার, দুধের পরিমাণ এবং প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়। সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা একটি পূর্ণবয়স্ক ছাগলের জন্য গড়ে ৮-১০ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ৫ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। দুটি ছাগী দ্বারা শুরু করা খামারে বছরে গড়ে ১০-১৩টি বিভিন্ন বয়সী ছাগল থাকবে। সেই হিসেবে একজন খামারিকে প্রায় ৬০ (৬ × ১০) বর্গ ফুট আয়তনের মাচা করতে হবে। এই মাচা খামারি ঘরের একাংশেও হতে পারে বা পরবর্তীতে আলাদা ঘরেও হতে পারে। ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড় দিয়ে তৈরি হতে পারে। মাচাটি বাঁশের তৈরি হতে পারে। মাটি থেকে মাচার উচ্চতা ৩ ফুট। ছাগলের বিষ্ঠা ও চনা পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা

কাঠকে ০.৫ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে। মাচার নিচ থেকে সহজে গোবর ও প্রস্রাব সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উঁচু করে দুই পার্শ্বে ঢালু (২%) রাখতে হবে। মেঝে মাটির হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি/ছাই দিতে হবে। বৃষ্টি যেন ঘরে না ঢুকে সে জন্য ছাগলের ঘরের চালা ১-১.৫ মি. (৩.২৮-৩.৭৭ ফুট) ঝুলিয়ে দেয়া প্রয়োজন। শীতকালে রাতের বেলায় মাচার চার পাশের দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শীতের সময় মাচার উপর ১০-১২ সে. মি. (৪-৫ ইঞ্চি) পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে। এসময় রাতে চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যা বাচ্চাকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাই খামারের অন্যতম প্রধান বিষয়। বয়স ও উৎপাদন ভিত্তিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপঃ

ছাগলের বাচ্চাকে শালদুধ ও সাধারণ দুধ খাওয়ানো

ছাগী বাচ্চা প্রসবের প্রথম তিন দিনের দুধকে কলস্ট্রাম বলে। সাধারণ দুধ ও শালদুধের কম্পোজিশন ১ নং সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ১ ঃ ছাগলের দুধ ও কলস্ট্রামের উপাদানের শতকরা হার

	ফ্যাট	প্রোটিন	লেকটোজ	খনিজ	মোট শুষ্ক পদার্থ
সাধারণ দুধ	৫.০৯	৩.৩৩	৬.০১	১.৬০	১৬.০৩
শালদুধ	৫.৬	৮.১০	৪.৮০	০.৮৫	২০.৩০

সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চার জন্মের সময় ওজন ০.৮-১.৫ কেজি (গড়ে ১.০০ কেজি) হয়। বাচ্চা জন্মের পরপরই পরিষ্কার করে আধা ঘন্টার মধ্যেই মায়ের শালদুধ খেতে দিতে হবে। বাচ্চাকে খাওয়ানোর নিয়ম হলো প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম শালদুধ খাওয়ানো। এই পরিমাণ দুধ দিনে ৮-১০ বারে ভাগ করে খাওয়াতে হবে। শালদুধ খাওয়াতে দেরি হলে উক্ত দুধ হজম হয়না। শালদুধ বাচ্চার শরীরে এন্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ শক্তিবৃদ্ধি করে। দুই বা ততোধিক বাচ্চা হলে প্রত্যেকেই যেন শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

ছাগলের বাচ্চাকে ঘাস খাওয়ানো

টেবিল-২ এ বলা হয়েছে যে, ছাগল ছানাকে জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঘাসের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে। সাধারণত শুরুতে মায়ের সাথেই ছাগল ছানা ঘাস খেতে শিখে। ভালভাবে অভ্যস্ত করলে এক মাসের মধ্যে বাচ্চাকে কচি ঘাস যেমন- দুর্বা, সেচি, আরাইলা, মাষকলাই, খেসারিসহ অন্যান্য উন্নত জাতের ঘাস যেমন- নেপিয়ার, রোজি, প্লিকাটুলাম, সেন্টোসোমা, এন্ড্রোপোগন প্রভৃতি ঘাস খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া, ইপিল ইপিল, কাঁঠালপাতা, ধইনচাপাতা ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। এসব ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে যা ছাগল ছানা তাদের চাহিদানুসারে খেতে চায়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ছানা সাধারণত ২-৩ মাসের মধ্যে দুধ ছাড়ে। জন্ম থেকে তিন মাস বয়স পর্যন্ত নিম্নোক্ত হারে ছাগল ছানাকে খাওয়ানো উচিত (সারণি ২)

সারণি ২ ঃ ছাগল ছানার বয়সভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দুধ (গ্রাম)	ভাতের মাড় (গ্রাম)	কচি ঘাস
০-২	২০০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	২৫০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	২৫০	১৫০	সামান্য পরিমাণ
৭-৮	২৩০	২৫০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
৯-১০	২১০	৩০০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
১১-১২	২০০	৩৫০	পর্যাপ্ত পরিমাণ

বিঃ দ্রঃ ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা উচিত।

বাচ্চার অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

১. জন্মের পর পর বাচ্চাকে পরিষ্কার করে নাভি থেকে ৩-৪ সে. মি. নিচে কেটে দিতে হবে।

২. বাচ্চাকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে জন্মের পরপরই শালদুধ/সাধারণ দুধ খাওয়াতে হবে।

৩. যে বাচ্চার মায়ের দুধের পরিমাণ কম তাদেরকে বোতলে অন্য ছাগলের দুধ/বিকল্প দুধ (মিল্ক রিপ্লেসার) খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে সবসময় ৩৮-৩৯° সে. তাপমাত্রার (হালকা গরম) দুধ খাওয়ানো উচিত।

৪. শীতের সময়ে বাচ্চাকে মায়ের সাথে চট/ছালা ঢাকা মাচায় ২৫-২৮° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।

৫. বাচ্চা যেন অতিরিক্ত দুধ না খায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। অতিরিক্ত দুধ বাচ্চার ডায়রিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৬. পাঁঠা বাচ্চাকে জন্মের ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করাতে হবে। প্রচলিত ওপেন পদ্ধতিতে খাসী করানো যায়। তবে এক্ষেত্রে যেন জীবাণু সংক্রামণ না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. বাচ্চাকে প্রতিদিন পূর্বে বর্ণিত নিয়মে কিছু কিছু কাঁচা ঘাস খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে।

বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্যব্যবস্থাপনা

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ৩-১২ মাস সময়কালকে মূল বাড়ন্ত সময় বলা যায়। এ সময়ে যেসব ছাগল প্রজনন বা মাংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে তাদের খাদ্য পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। দুধ ছাড়ানোর পর থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত সময়ে ছাগলের পুষ্টি সরবরাহ অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে থাকে। এ সময়ে একদিকে ছাগল দুধ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন ও বিপাকীয় শক্তি থেকে যেমন

বঞ্চিত হয় তেমনি মাইক্রোবিয়ালফার্মেন্টেশন থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি সরবরাহও কম থাকে। এজন্য এ সময়ে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। সারণি ৩-এ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক দানাদার খাদ্য ও ঘাসের পরিমাণ দেয়া হলো।

সারণি ৩ ঃ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ

আনুমানিক বয়স (মাস)	ছাগলের ওজন (কেজি)	দানাদার খাদ্য দৈনিক সরবরাহ (গ্রাম)	ঘাস/পাতা সরবরাহ/ চরানো (কেজি)
২	৪	১০০	০.৪
৩	৬	১৫০	০.৬
৪	৮	২০০	০.৮
৬	১০	২৫০	১.৫
৭	১২	৩০০	২.০
৯	১৪	৩৫০	২.৫
১১	১৬	৩৫০	৩.০
১২	>১৮	৩৫০	৩.৫

দানাদার খাদ্যের পরিমাণ সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। ঘাসের পরিমাণ ও গুণগত মান বেশি হলে দানাদার খাদ্যের পরিমাণ কমবে এবং পরিমাণ ও গুণগত মান কম হলে উপরোক্ত পরিমাণ দানাদার খাদ্যেই চলবে।

দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

দুগ্ধবতী ছাগল তার ওজনের ৫-৬ শতাংশ হারে খাদ্য খেয়ে থাকে। একটি তিন বছর বয়স্ক ২য় বার বাচ্চা দেয়া ছাগীর গড় ওজন ২০-২৫ কেজি হারে দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ০.৭৫-১.০ কেজি পরিমাণ শুষ্ক পদার্থ ঘাস থেকে (২-৩ কেজি কাঁচা ঘাস) বাকি ০.২৫-০.৪০ কেজি শুষ্ক পদার্থ দানাদার খাদ্য থেকে দেয়া উচিত। যেহেতু উপযুক্ত পরিবেশে ছাগী বাচ্চা দেয়ার ১.০-১.৫ মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয় সেজন্য প্রায় একই পরিমাণের খাবার গর্ভাবস্থায়ও ছাগলকে দিতে হবে। বিএলআরআই-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই হারে খাওয়ালে ছাগল-

১. দৈনিক ৪০০-১০০০ গ্রাম পর্যন্ত দুধ দেয়,

২. গড়ে বাচ্চা দেয়ার ২১ দিনের মাথায় গরম হয়,

৩. বছরে দুই বার বাচ্চা দেয়,

৪. জন্মের সময় বাচ্চার গড় ওজন (<১.০ কেজি বনাম >১.৫ কেজি) হয়।

বাড়ন্ত ছাগল, প্রজননক্ষম পাঁঠা, দুগ্ধ ও গর্ভবতী ছাগলের জন্য নিম্নলিখিত দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে (সারণি ৪)।

সারণি ৪ ঃ ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ

উপাদান	পরিমাণ (%)
গম/ভুট্টা ভাঙ্গা/চাল	১২.০০
গমের ভুসি/আটা/কুঁড়া	৪৭.০০
খেসারি/মাষকলাই/অন্য ডালের ভুসি	১৬.০০
তিল/সরিষা/নারিকেল খৈল	২১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবণ	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০
আনুমানিক মূল্য	৮-৯ টাকা (প্রতি কেজি)

ছাগলের আঁশ জাতীয় খাবার

কাঁচা ঘাস/কাঁচা পাতা

বর্তমানে আমাদের দেশে চারণভূমি নেই বললেই চলে। খামারিগণ সাধারণত পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে, জমির আইলে ছাগল চরান। এ ক্ষেত্রে সাধারণত প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়া যায়না। তাই বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ঘাস যেমন: নেপিয়ার, পারা, স্পেলনডিডা, খেসারি, মাষকলাই, জার্মান ইত্যাদি ছোট (১০×৫ বর্গ মিটার) জমিতে লাগিয়ে তা থেকে প্রয়োজনীয় (বিভিন্ন বয়সের ১০-১২টি ছাগলের জন্য দৈনিক ১২-১৪ কেজি) ঘাস সহজে সরবরাহ করা যায়। তাছাড়া বাড়ি, পুকুর পাড়, পতিত জমি ইত্যাদির পাশে ও উপরোক্ত জাতের ঘাসসহ কাঁঠাল গাছ, ইপিল ইপিল গাছ লাগিয়ে তা থেকে সরাবছর ঘাস ও পাতা সংগ্রহ করা যায়। শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করে ঘাস/পাতার উৎপাদন অব্যাহত রাখা যায়।

প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো

ছাগলকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৮২% খড়ের সাথে ৩% ইউরিয়াও ১৫% চিটাগুড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। অথবা খড়কে ৫% ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো যেতে পারে। ঘাস বা খড়কে ১.৫-২ ইঞ্চি আকারে কেটে দেয়া উচিত। শুধু খড় খাওয়ালে খড়ের সাথে অ্যালজির পানি সরবরাহ করলে প্রয়োজনীয় ভিটামিন পাওয়া যায়।

ছাগীর প্রজনন ব্যবস্থাপনা

যদিও একটি ছাগী ৫/৬ মাস বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয় কিন্তু ৭-৮ মাস বয়স (প্রায় ১১-১২ কেজি ওজন) না হওয়া পর্যন্ত পাল দেয়া উচিত নয়। পাল দেয়ার পূর্বে ছাগী সঠিক গরমে আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ছাগীর গরম আসার লক্ষণগুলো হচ্ছে- মিউকাস নিঃসরণ, ডাকাডাকি

করবে, অন্য ছাগীর উপর উঠবে, ইত্যাদি। ছাগীর গরম নির্ণয় করলেই শুধু হবে না, জানতে হবে পাল দেয়ার সঠিক সময় কোনটি। ছাগী গরম হওয়ার ১২-৩৬ ঘন্টার মধ্যে পাল দেয়া উচিত। অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে, আবার বিকেলে গরম হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য নিয়মিত টিকা, কৃমিনাশক ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। ছাগলের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ পি পি আর এবং গোট পক্সের ভেক্সিন জন্মের ৩ মাস পরে দিতে হয়। বছরে দুবার কৃমিনাশক খাওয়ানো উচিত। এক্ষেত্রে বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে) এবং বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর) ব্রডস্পেক্ট্রাম কৃমিনাশক যেমন: নেমাফেক্স, রেলনেক্স ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া যকৃত কৃমির জন্য ফেসিনেক্স, ডোভাইন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো ছাগলের চর্মরোগ দেখা দিলে তা ফার্ম থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যে কোনো ছাগল খামারে প্রবেশ করানোর আগে কমপক্ষে ১৫-২০ দিন অন্য স্থানে রেখে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। খামারের সকল ছাগলকে ১৫-৩০ দিন পর পর ০.৫% মেলাথায়ন সলিউশনে ডিপিং করানো (চুবানো) উচিত। তাছাড়া ওলান পাকাসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাঁঠার ব্যবস্থাপনা

প্রজননক্ষম পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাড়ন্ত ছাগলের মতই। তবে প্রজননে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন। একটি পাঁঠা ১০ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে। কোনভাবেই পাঁঠার শরীরে বেশি চর্বি জমতে দেয়া উচিত নয়। ২৮-৩০ কেজি ওজনের পাঁঠার জন্য দৈনিক সর্বোচ্চ ৪০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে।

পাঁঠার প্রজনন ব্যবস্থাপনা

একটা পাঁঠা সাধারণত ৩/৪ মাস বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয় কিন্তু আট/নয় মাস বয়সের পূর্বে পাল দেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কোন পাঁঠার শারীরিক দুর্বলতা, পঙ্গুত্ব বা কোনো যৌন অসুখ সমস্ত পালকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাই সেদিকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। দশটি ছাগীর জন্য একটি পাঁঠাই যথেষ্ট। একটি পাঁঠাকে সপ্তাহে ৭-১০ বারের বেশি প্রজনন কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।

বাজারজাতকরণ

উৎপাদিত ছাগলের বাজারজাত খামারি সরাসরি নিজেই করবেন। এক্ষেত্রে পাঁঠীকে ৬-৭ মাসের মধ্যে এবং খাসীকে ১২ মাসের মধ্যে বিক্রি করবেন।

ছাগল খামারের আয়-ব্যয়

ছাগলের খামারে অর্জিত আয় ব্যয়ের হিসাব ৫ নং সরণিতে দেয়া হলো। এখানে প্রণিধানযোগ্য

যে, স্বল্প সংখ্যক (১০-১২টি) ছাগল পালনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বছর হতে অর্জিত আয় আনুমানিক বছরে ৪,০০০-৬,০০০ টাকা। তবে ছাগল পালন পরিবারে বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করবে এবং প্রয়োজনে বিশেষত বিভিন্ন বিপদাপদ, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান "জীবন্ত ব্যাংক" হিসেবে কাজ করবে। এতে খামারির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

সারণি ৫ ঃ ছাগলের খামারে ৫ বছরে বিভিন্ন বয়সের ছাগলের সংখ্যা ও আয়-ব্যয়

	বছর				
	১	২	৩	৪	৫
বছরের শুরু					
ছাগী	২	২	৪	৪	৪
বাড়ন্ত	-	১	৩	২	১
বাচ্চা	-	৪	৪	৬	৬
মোট	**২**	**৭**	**১১**	**১২**	**১১**
মৃত্যুঃ ছাগী					
বাড়ন্ত					
বাচ্চা	১	২	৩	৩	৩
বছরের শেষে					
ছাগী	২	৪	৪	৪	৫
বাড়ন্ত	৩	৭	৯	৮	৮
বাচ্চা	৪	৪	৬	৬	৮
মোট	**৯**	**১৫**	**১৯**	**১৮**	**২১**
বিক্রি					
খাসী	-	২	৩	৪	৪
বাড়ন্ত ছাগী	২	২	৪	৩	৪
ছাগল বিক্রি থেকে আয়	২×৬০০=১২০০	২×৬০০=১২০০ ২×২০০০=৪০০০	৪×৮০০=৩২০০ ৩×২০০০=৬০০০	৩×৮০০=২৪০০ ৪×২০০০=৮০০০	৪×৮০০=৩২০০ ৪×২০০০=৮০০০
মোট	**১,২০০**	**৫,২০০**	**৯,২০০**	**১০,৪০০**	**১১,২০০**
খরচ (বার্ষিক)	৪,০০০				
ছাগল					
খাদ্য	২,০০০	৩,০০০	৪,৫০০	৪,৫০০	৪,৫০০
ঔষধ	২০০	২০০	৩০০	৩০০	৩০০
অন্যান্য	১০০	১৫০	২০০	২০০	২০০
মোট	**৬,৩০০**	**৩,৩৫০**	**৫,০০০**	**৫,০০০**	**৫,০০০**
নীট লাভ		১,৮৫০	৪,২০০	৫,৪০০	৬,২০০

প্যাকেজের উদ্ভাবক ঃ ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী

সবুজ ঘাস উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

লাভজনক দুগ্ধ খামারের জন্য ঘাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পূর্বে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক চারণভূমি ছিল যেখানে চড়ে গাভী তার প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাত। বর্তমানে সে সুযোগ অত্যন্ত কম। তাই গাভীর প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাতে খামারি ভাইদের অবশ্যই উচ্চফলনশীল ঘাসের আবাদ করতে হবে। নিম্নে কয়েকটি বহু বর্ষজীবী ঘাসের উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

নেপিয়ার (Pennisetum pur-pureum)

নং	নেপিয়ার (বাজরা)	ঃ	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	ঃ	জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটি এমনকি পাহাড়ি ঢাল ও সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত জমিতেও ঘাস জন্মে।
৩	জমি তৈরি	ঃ	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	হে. প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মোথা
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ৭০ সিএম. কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হে.
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	৩০-৪৫ দিন পর পর-গ্রীষ্মকাল ৫০-৬০ দিন পর পর-শীতকালে (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৫-৬ বার - ১ম বছর ৭-৯ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	১৫০ - ২০০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ২৫০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ২৫ গ্রাম ও ২.০ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ তৈরি

নেপিয়ার (পাকচং)

চমি চাষঃ	জমি গভীর চাষ করতে হবে। এতে গাছের খরা সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
নালা তৈরিঃ	সোয়া এক মিটার দুরত্বে অগভীর নালা কেটে কাটিং রোপণ করা ভালো।
রোপণঃ	নালার দুই পাশে ৬০ নেনিটমিটার দুরত্বে কাটিং রোপন করতে হবে। যে কোন সময়ে রোপন করা যায।
সেচঃ	রোপণের পর সেচ দিতে হবে। কাটিং অঙ্কুরিত হতে সহায়ক হবে। কর্তন শুরু করার পর সেচ দিলে গাছের বর্ধন দ্রুত হয় এবং গোড়া থেকে নতুন কুশি বের হতে থাকে।
গার প্রয়োগঃ	জমিতে শতক প্রতি ২০ থেকে ৪০ কেজি জেব সার দিতে হবে। এ ছাড়া আধা কেজি ইউরিয়া, ১ কেজি টিএসপি এবং সোয়া কেজি এমপি সার দেয়া যেতে পারে।
কর্তনঃ	রোপণের তিম মাস পর কর্তন করা যাবে। প্রথম কর্তনের দেড় মাস থেকে দুই মাস পুনরায় কর্তন করা যাবে। এইভাবে পুনপুন কর্তন করা যাবে।

এন্ড্রোপোগন (Andropogon gyanus)

নং	এন্ড্রোপোগন	ঃ	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে
২	মাটির ধরন	ঃ	লবণাক্ত মাটি ও জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। তবে পাহাড়ের চূড়াতে বা বেশি ঢালু জমিতে এ ঘাস ভাল জন্মায় না
৩	জমি তৈরি	ঃ	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে মুথা লাগানো যেতে পারে
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	২৮-৩০ হাজার মুথা প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ ৭০ সিএম; কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হে.
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	২৫-৩০ দিন ঃ গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন ঃ শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৭-৯ বার - ১ম বছর ৯ - ১১ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	১০০ - ১৩০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	শুষ্ক পদার্থ ৩৭০ গ্রাম, জৈব পদার্থ ৩৩৮ গ্রাম, প্রোটিন ২২ গ্রাম,ফাইবার ১৪৬ গ্রাম, পাচ্যতা ৬৪% ও বিপাকীয় শক্তি ৩.৭৮ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ তৈরি

স্প্লেনডিডা (Setaria splendida)

নং	স্প্লেনডিডা	ঃ	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়।
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে
২	মাটির ধরন	ঃ	জলাবদ্ধ লবণাক্ত ও পাহাড়ি ঢাল ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের জায়গায় এ ঘাস জন্মে
৩	জমি তৈরি	ঃ	উত্তম ভাবে চাষ করে জমি তৈরী করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে মুথা লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	৩৫-৪০ মুথা/কাটিং প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ৭০ সিএম; কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হে.
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	২৫-৩০ দিন ঃ গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন ঃ শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৭-৯ বার ১ম বছর ৯-১১ বার ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	১০০-১৩০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	শুষ্ক পদার্থ ৩৩৫ গ্রাম, জৈব পদাথ ৩১৭ গ্রাম, প্রোটিন ২১ গ্রাম, ফাইবার ১৮৩ গ্রাম পাচ্যতা ৬০% ও বিপাকীয় শক্তি ৩.২০ মেগাজুল।
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি।

রোজী (Bracharia ruziziensis)

নং	রোজী	ঃ	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয় ।
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ।
২	মাটির ধরন	ঃ	জলাবদ্ধ ও পাহাড়ি ঢাল ছাড়া বাংলাদেশের সব জায়গায় এ ঘাস জন্মে । এ ঘাস মধ্যম মানেরলবণাক্ততা সহ্য করতে পারে ।
৩	জমি তৈরী	ঃ	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে । বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে মুথা লাগানো যেতে পারে ।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	প্রতি হেঃ ৩৫-৪০ হাজার মুথা ।
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ৭০ সিএম; কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হে.
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	৩০-৩৫ দিন পর পর–গ্রীষ্মকাল ৩৫-৪৫ দিন পর পর–শীতকালে (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৭-৮ বার - ১ম বছর ৮-১০ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	৭০ - ৯০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	শুষ্ক পদার্থ ২২০ গ্রাম, জৈব পদার্থ ১৯৯ গ্রাম প্রোটিন ২৬ গ্রাম, ফাইবার ১১৬ গ্রাম প্রাচ্যতা ৬০%ও বিপাকীয় শক্তি ২.১০ মেগাজুল ।
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি ।

সিগনাল (Bracharia decumbens)

নং	সিগনাল	ঃ	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোন সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে
২	মাটির ধরন	ঃ	জলাবদ্ধ স্থান ও পাহাড়ি ঢাল ও লবণাক্ত স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব জায়গায় এ ঘাস জন্মে
৩	জমি তৈরি	ঃ	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	হেঃ প্রতি ৩৫-৪০ হাজার মোথা
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ৭০ সিএম; কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হেঃ
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হেঃ
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হেঃ
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	৩০-৩৫ দিন পর পর–গ্রীষ্মকাল ৩৫-৪৫ দিন পর পর–শীতকালে (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৭-৮ বার - ১ম বছর ৮-১০ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	৭০ - ৯০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	শুষ্ক পদার্থ-২৫৫ গ্রাম, জৈব পদার্থ-২২৮ গ্রাম, প্রোটিন-১৯ গ্রাম, ফাইবার-১৩১ গ্রাম, পাচ্যতা-৬০% ও বিপাকীয় শক্তি ২.৪৭ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি

জাম্বু

নং	জাম্বু	ঃ	এক থেকে বহুবর্ষ জীবী, একবার লাগালে দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে
২	মাটির ধরন	ঃ	জলাবদ্ধ স্থান ও পাহাড়ি ঢাল ও লবণাক্ত স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব জায়গায় এ ঘাস জন্মে
৩	জমি তৈরি	ঃ	উত্তম ভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	৭ কে. জি. প্রতি হেঃ বা হেঃ প্রতি ৩৫-৪০ হাজার কাটিং/মোথা
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ ৭০ সিএম; কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হে.
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	৩০-৪৫ দিন পর পর–গ্রীষ্মকাল ৪০-৫০ দিন পর পর–শীতকালে (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৫-৬ বার - ১ম বছর ৭-৮ বার - ২য় বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	১০০ - ১৫০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	শুষ্ক পদার্থ ১৯০ গ্রাম, জৈব পদার্থ ১৮০ গ্রাম প্রোটিন ২১ গ্রাম, ফাইবার ৭৫ গ্রাম পাচ্যতা ৬৪% ও বিপাকীয় শক্তি ১.৯৫ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ তৈরি

পারা (Bracharia mutica)

নং	পারা	ঃ	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৭-৮ বছর এ ঘাস জন্মে
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে
২	মাটির ধরন	ঃ	জলাবদ্ধ, লবণাক্ত, পাহাড়ি ঢালসহ সব ধরনের মাটিতে জন্মে
৩	জমি তৈরি	ঃ	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	২৮-৩০ হাজার কাটিং
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ ৭০ সিএম; কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হে.
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	৩০-৩৫ দিন পর পর-গ্রীষ্মকাল ৩৫-৪৫ দিন পর পর-শীতকালে (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৬-৭ বার - ১ম বছর ৭-৯ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	১০০ - ১২০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	শুষ্ক পদার্থ ২৬০ গ্রাম, জৈব পদার্থ ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ১৮ গ্রাম, ফাইবার ১১৩গ্রাম, পাচ্যতা ৬৪% ও বিপাকীয় শক্তি ২.৬০ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ তৈরি

নেপিয়ার (বাজরা) ঘাস

নেপিয়ার (হাইব্রিড) ঘাস

নেপিয়ার (পাকচং)

স্প্লেনডিডা

রোজী ঘাস

সিগনাল ঘাস

জাম্বু ঘাস

পারা ঘাস

নেপিয়ার ঘাস চাষ ও ব্যবসা

বাংলাদেশে চাষকৃত পশুখাদ্যের মধ্যে নেপিয়ার ঘাস উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় নেপিয়ার ঘাস খুব ভালো জন্মে। কচি অবস্থায় এর পুষ্টিমান বেশি থাকে। এ ঘাস একবার রোপণ করলে ৪-৫ বছর পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। বছরের যে কোনো সময় এ ঘাস চাষ করা যায়। তবে ফাল্গুন-চৈত্র মাস নেপিয়ার ঘাস চাষের জন্য ভালো সময়। পানি জমে - এমন জায়গা ছাড়া বাংলাদেশের যে কোনো ধরনের মাটি, এমনকি পাহাড়ি ঢাল ও হালকা লবণাক্ত জমিতেও এ ঘাস জন্মে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর জমিতে মাষকলাই এর সাথে লাইন টেনে নেপিয়ার ঘাস চাষ করা যেতে পারে।

চাষ পদ্ধতি

প্রায় সব মাটিতেই এ ঘাস জন্মালেও উঁচু ও বেলে দোআঁশ মাটি নেপিয়ার চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথমে জমি ভালোভাবে চাষ দিতে হয়। জমিতে ৩/৪ টি চাষ দিয়ে ভালোভাবে আগাছা মুক্তকরণের পর কাণ্ড (মুকুল বা বাড সহ) কেটে অথবা শিকড়সহ ঘাসের মুথা মাটিতে পুততে হয়। সাধারণত হেক্টরপ্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মুথা প্রয়োজন হয়। কাটিং রোপণের সময় এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব ১.৫-২.০ ফুট এবং এক কাটিং হতে অন্য কাটিং এর দূরত্ব ১.০-১.৫ ফুট রাখতে হয়। রোপণের পর চারার গোড়া মাটি দিয়ে শক্ত করে চাপা দিতে হয়। মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে চারা লাগানোর পরপরই সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

জমি প্রস্তুতকালে একর প্রতি ২০০০-২৫০০ কেজি গোবর সার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া একর প্রতি ৩৫ কেজি ইউরিয়া, ২৬ কেজি টিএসপি ও ২০ কেজি এমপি দিলে ফলন ভালো পাওয়া যায়। প্রতিবার ঘাস কাটার পর একর প্রতি ২৬ কেজি হারে ইউরিয়া সার প্রদান করলে পরবর্তী ফলন ভালো হয়। সার ছিটানোর আগে দুই সারির মাঝখানের মাটি ভালোভাবে লাঙ্গল অথবা কোদাল দিয়ে আলগা করে দিতে হবে।

ঘাস কাটা ও ফলন

নেপিয়ার ঘাস লাগানোর ৪০-৪৫ দিন পর গবাদি পশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। গরম কালে ৩০-৪৫ দিন পর পর এবং শীতকালে ৫০-৬০ দিন পর পর এ ঘাস কাটা যায়। ঘাস কাটার সময় গোড়ার দিকে ২-৩ ইঞ্চি রেখে কাটতে হবে। প্রতি বছর ১ একর জমিতে ৬০০০০ থেকে ৬৫০০০ কেজি (৬০-৬৫ মেট্রিক টন) কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়।

সেচ

বর্ষা মৌসুমে সেচের প্রয়োজন নাই, তবে শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ প্রদান করতে হয়।

ঘাসের পরিচর্যা

নেপিয়ার ঘাস কাটার পর গরুকে খাওয়ানো ভালো। কারণ জমিতে গরু-ছাগল চরতে দিলে মাটি শক্ত হয়ে যায় অথবা ঘাসের গোড়া আলগা হয়ে ঘাস মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিবার সার প্রয়োগের আগে সম্ভব না হলে বছরে দুইবার ঘাসের সারির মাঝখানের মাটি ভালোভাবে আলগা করে দিতে হয়। এতে ঘাসের শিকড় ভালোভাবে ছড়াতে পারে এবং সহজে মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে। পৌষ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত শীতের তীব্রতা ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে নেপিয়ারের ফলন একেবারে কমে যায়। এসময় ছাগল যাতে ডগা নষ্ট করতে না পারে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

খাওয়ানোর নিয়ম

ঘাস কাটার পর টুকরো টুকরো করে গবাদি পশুকে খাওয়ানো যায়। এছাড়া ২-৩ ইঞ্চি করে কেটে খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। নেপিয়ার ঘাস শুকিয়ে সংরক্ষণ করলে পুষ্টিমান কমে যায়। তবে সাইলেজ (কাঁচা ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণ) আকারে সংরক্ষণ করলে পুষ্টিমান অটুট থাকে।

নেপিয়ার ঘাস চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব (১ একর জমিতে)

উপকরণ	প্রয়োজন	একক মূল্য	মোট ব্যয়	কত বছর টিকে	অবচয়/বছর
লাঙ্গল	১	১০০০	১০০০	৫	২০০.০০
কোদাল	৬	২৫০	৫০০	৫	৩০০.০০
নিড়ানি	১০	৮০	৮০০	৩	২৬৫.০০
মই	১	১৫০	১৫০	৩	৫০.০০
মোট					৮১৫.০০

স্থায়ী খরচ

এক একর জমি লিজ নিলে খরচ হয় ১০,০০০ প্রতি বছর
তাহলে মোট স্থায়ী খরচঃ জমির লিজ খরচ + অবচয়
= ১০,০০০+ ৮১৫ = ১০,৮১৫ টাকা

নেপিয়ার হতে আয়

প্রতি একরে ৬০,০০০ কেজি উৎপাদন হলে এবং প্রতি কেজি ২.০০ টাকা দরে মোট বিক্রিঃ ৬০,০০০X ২.০০
= ১,২০,০০০ টাকা

মোট লাভ :

১২০০০০ - (২৫০৪০+১০৮১৫) =৮৪১৪৫ টাকা, এছাড়া সাথী ফসল হিসেবে নেপিয়ার ক্ষেতে চতুর্দিকে মিষ্টি কুমড়া লাগানো যায়।

(রোপণের সময় ৩৫ কেজি ইউরিয়া এবং রোপণের পর বছরে কমপক্ষে ৫ বার ২৬ কেজি হারে ইউরিয়া ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। তবে অন্যান্য সার একবার প্রয়োগ করলেও চলে)

চলতি খরচ

কাঁচা মালের বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য
কাটিং/মুথা ক্রয়	৩০ বস্তা	২০০.০০	৬০০০.০০
জমি চাষ	৩ চাষ	৫০০.০০	১৫০০.০০
ইউরিয়া	১৬৫ কেজি	১২.৫০	২০৬০.০০
টিএসপি	২৬ কেজি	৮০	২০৮০.০০
এমপি	২০ কেজি	৪৫.০	৯০০.০০
গোবর সার	২০০০ কেজি	১.০০	২০০০.০০
লেবার (রোপণ)	২০ জন	২০০.০০	৪০০০.০০
সেচ	-		১৫০০.০০
আগাছা দমন, পরিচর্যা,	-		৫০০০.০০
পরিবহন ও অন্যান			২৫০৪০.০০

প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান

প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে ২৫০ গ্রাম শুষ্ক পদার্থ, ২৪০ গ্রাম জৈব পদার্থ, ২৫ গ্রাম প্রোটিন ও ২.০ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি বিদ্যমান।

ডোল পদ্ধতিতে
কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ
প্রযুক্তি
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

ভূমিকা ঃ

আমাদের দেশে গবাদিপশু উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে খাদ্য সংকট। বর্ষাকালে প্রাকৃতিক দেশী ঘাস পর্যাপ্ত পাওয়া গেলেও শুকনো মৌসুমে ঘাসের সংকট দেখা যায়। তাই এই সময়ে অধিক পরিমাণ উৎপাদিত ঘাস সংরক্ষণ করে রাখলে সারাবছর পশুকে সরবরাহ করা যায়। কাঁচা ঘাস দিয়ে সাইলেজ তৈরীর প্রযুক্তিটি ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু কম খরচে তা সংরক্ষণের যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন না হওয়ায় খামারীরা প্রযুক্তিটির শতভাগ সুফল থেকে এখনও বঞ্চিত। খামারীদের চাহিদার আলোকে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) দীর্ঘদিন যাবৎ এই সমস্ত প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সাইলেজ সংরক্ষণের অনেক পদ্ধতি নিয়ে গবেষণার পরে দেখা গেছে যে, গ্রামীণ পর্যায়ে সবচেয়ে সাশ্রয়ে যে প্রযুক্তির মাধ্যমে সাইলেজ সংরক্ষণ করা যায় সেটি হচ্ছে "ডোল সাইলেজ"। গ্রামীণ পর্যায়ে সাধারণতঃ কৃষকরা ধান সংরক্ষণের জন্য বাঁশের তৈরী যে ডোল ব্যবহার করে থাকে সেটি দিয়েই কম খরচে সাইলেজ তৈরী করা যায়।

সাইলেজ কি?

সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্হায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাস বা গাঁজনকৃত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলে। বায়ুহীন পরিবেশে পর্যাপ্ত আর্দ্রতাযুক্ত (৬০-৬৫%) ফরেজ বা সবুজ ঘাসকে সংরক্ষণ করলে এতে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়াকে এনসাইলিং বলে। সাইলেজ তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যে মৌসুমে সবুজ ঘাসের আধিক্য বেশী থাকে, সে মৌসুমে সাইলেজ প্রস্তুত করা এবং সবুজ ঘাসের অভাবের সময় গবাদি পশুকে তার সরবরাহ নিশ্চিত করা। এতে কাঁচা ঘাসের অপচয় কম হয় এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। যদিও সাইলেজ পুষ্টিমান তার ঘাসের উপর এবং কোন্ অবস্থায় কাটা হচ্ছে, মাটির আদ্রতার উপর নির্ভর করে তথাপিও নিম্নে নেপিয়ার ঘাসের পুষ্টিমান দেয়া হলো ঃ

সাইলেজের পুষ্টিমান (নেপিয়ার ঘাস) ঃ

ক্র. নং	পুষ্টি গুণাগুণ	পুষ্টিমান
০১	শুষ্ক উপাদান (%)	১৭.৫০
০২	জৈব উপাদান (%)	৮৮.২৫
০৩	অশোধিত আমিষ (%)	১০.২০
০৪	ছাই (%)	১১.৫৬
০৫	এডিএফ (%)	৪৬.৫০

সাইলেজের উপকারিতা ঃ

বর্ষা মৌসুমে কাচা ঘাস সংরক্ষণ বরা কঠিন কিন্তু সাইলেজ সহজেই করা সম্ভব, যা অত্যন্ত সুস্বাদু ও ল্যাকটিক এসিড সমৃদ্ধ খাদ্য এবং আমিষ ও ভিটামিনের উৎসও বটে।

সাইলেজ তৈরীর উপযোগী ফডার ঃ

সাইলেজ তৈরী করার জন্য সাধরণতঃ কম নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ ফডার বা সবুজ ঘাস যেমন, ওট, ভূট্টা, যোয়ার, নেপিয়ার সবচেয়ে বেশী উপযোগী। তবে অধিক নাইট্রোজেন যুক্ত সবুজ ঘাস যেমন, বারশিম, লুসার্ণ, কাউপি কিংবা মাটি কালাই জাতীয় দিয়েও সাইলেজ তৈরী করা যেতে পারে। তবে এসব ঘাসের ক্ষেত্রে অন্য ঘাস বা খড় স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাইলেজ করা যায়।

ডোল সাইলেজ তৈরীর পদ্ধতি ঃ

আমাদের দেশের যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরী খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য ডোল পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের তাগিতে ৮০ কেজি থেকে ১,০০০ কেজি আকারের ডোল সাইলো তৈরী করতে পারেন।

এ ধরনের ডোল সাইলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজেই স্থানান্তর করা যায়। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন গবাদি পশু না থাকলেও তিনি তার নিজস্ব জমিতে শুধু ঘাস উৎপাদন এবং ডোল সাইলো করে সংরক্ষিত সাইলেজ বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। কেননা ডোল সাইলো অতি সহজেই পরিবহন করা যায়। মাটির গর্তে সাইলেজ তৈরীর যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, ডোল পদ্ধতিতে ঠিক একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ডোল পরিপূর্ণ করার পর ভালভাব মুখ বেধে রাখতে হবে।

ডোল চার প্রকারে তৈরী ও সংরক্ষণ করা যায় যথাঃ (১) হাট-বাজারে বাঁশের তৈরী ধান রাখার যে গোলাকার ডোল পাওয়া যায় সেটির ভেতরে পলিথিন মুড়িয়ে বায়ুরোধক করে, (২) একই ডোলের ভেতরে পলিথিন মুড়িয়ে এবং বাহিরে মাটি, তুষ ও গোবরের প্রলেপ দিয়ে বায়ুরোধক করে, (৩) প্লাস্টিক কন্টেইনার (ড্রাম) এবং (৪) শুধু পলিথিনের ডোল তৈরী করে সংরক্ষণ। তবে সাইলো তৈরীর খরচ, ব্যবহারের স্থায়িত্ব কাল ও গুনগত মান বিবেচনা করে দেখা গেছে যে, প্রথম পদ্ধতিটিই গ্রামিন খামারী পর্যায়ে সাশ্রয়ী পদ্ধতি। যে ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুত করা হবে, তা প্রথমে টুকরা টুকরা (প্রায় ৩-৪ ইঞ্চি পরিমাণ) কেটে নিতে হবে। সাইলোতে (যেখানে সাইলেজ সংরক্ষণ করা হবে) ঘাস দেওয়ার পূর্বে সেটা পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হবে এবং নীচে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে খড় বিছাতে হবে। টুকরা টুকরা করা সবুজ ঘাস সাইলোর মধ্যে স্তরে স্তরে সাজাত হবে যেন ভিতরে বাতাস না থাকে। ফডার বা ঘাস যত বেশী চেপে সাইলোতে রাখা যাবে, সাইলেজ তত বেশী উন্নত মানের হবে। সাইলেজ লালীগুড়/চিটাগুড় সহ অথবা ছাড়াও করা যেতে পারে। চিটাগুড় ব্যবহার করলে, সুবজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ঃ১ অথবা পাতলা করে ৪ঃ৩ পরিমাণে পানি মিশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানোর উপযোগী হবে। ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশানো যাবে। প্রতি পরতে (স্তরে) পরতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘাসের জন্য পূর্বের হিসেবে যতটুকু চিটাগুড় লাগবে তা নিয়ে তা পরিমাণমত পানিতে মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। সবুজ ঘাসের সাথে শুকনো খড় ব্যবহার করলে এক স্তর কাঁচা ঘাস এবং এক স্তর খড় দিতে হবে। উপরের নিয়মে প্রতি ১০০ কেজি সবুজ ঘাসের সাথে ৫ কেজি খড় দিতে হবে এবং ঘাস সাজানোর পর চিটাগুড় দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন মোলাসেস বা চিটাগুড় দিতে হবে না। যতটা সম্ভব ভালভাবে পা দিয়ে পাড়িয়ে/মাড়িয়ে ভাল ভাবে আট সাট করে ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। সবুজ ঘাস যত এঁটে সাজানো যাবে সাইলেজ তত সুন্দর হবে এবং বেশি দিন সংরক্ষণ করা যাবে। সাইলো ভর্তি হলে মুখের উপরে ৪-৫ ইঞ্চি পর্যন্ত খড় সাজাতে হবে। সব শেষে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পলিথিন দিয়ে ঢাকার পর ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে যাতে বাতাসে উড়ে না যায় বা অন্য কোন পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সাইলো একদিনেই সাজানো ভাল। তবে একদিনে বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে সাজানো সম্ভব না হলে প্রতিদিন অল্প অল্প করেও ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে এ কাজটি সমাধা করতে হবে।

সাইলেজ তৈরীর সময় যে বিষয় খেয়াল রাখা উচিত

উপরের পলিথিন সুন্দরভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোন পানি "সাইলেজ" এর ভিতরে প্রবেশ করতে না করে। চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে অর্থাৎ এমনভাবে দ্রবণ তৈরী করতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাকে। ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়।

প্রয়োজনে সাইলেজে এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ সংযোজন

সাইলেজের পুষ্টিমান ও সংরক্ষণ গুণাবলী বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত হারে যে কোন এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা যায়।

লালীগুড় ঃ ৩-৪ %, ইউরিয়া ঃ ০.৫%,লাইমস্টোন ঃ ০.৫-১% , জৈব এসিড ঃ ১%, ব্যাটেরিয়াল কালচারঃ প্রয়োজন মত

ভাল সাইলেজের বৈশিষ্ট্য

হলুদাভ সবুজ ও আচারের ন্যায় অম্ল সুগন্ধ বিশিষ্ট, পিএইচ ৩.৫-৪.৫

গো-খাদ্য হিসেবে সাইলেজের ব্যবহার

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় দৈনিক গড়ে তার দৈহিক ওজনের ১.৯২ হারে সাইলেজ শুষ্কপদার্থ গ্রহন করে থাকে। দুধাল গাভী প্রতিদিন কি পরিমান দুধ উংপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। সাইলেজ এককভাবে কিংবা কাঁচা ঘাস অথবা শুকনা খড়ের সাথে গবাদি পশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণ নিয়মে দুই ভাগ সাইলেজ এর সাথে এক ভাগ কাঁচা ঘাস ও এক ভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

ডোল সাইলেজের আর্থিক মূল্যায়ন

খরচের খাত সমূহ	টাকা
ঘাসের পরিমাণ (১০০০ কেজি)	
প্রতি কেজির উৎপাদন মূল্য ০.৭৫ টাকা হিসাবে ঘাসের মূল্য (টাকা)	৭৫০/-
শ্রমিক খরচ (টাকা)	৪৫০/-
ম্যাটেরিয়াল ক্রয় খরচ (টাকা)	১৫২৫/-
১০০০ কেজি সাইলেজ তৈরীতে সর্বমোট খরচ	২৭২৫/-

বিঃদ্রঃ প্রতি কেজি সাইলেজ তৈরীর খরচ ২.৭৫ টাকা

উপসংহার:

আমাদের দেশে কাঁচা ঘাসের অভাবের সময় ডোল সাইলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবক

ড. নাথু রাম সরকার
ড. মোঃ আহসান হাবীব
ড. মোঃ জিল্লুর রহমান
মোঃ রুহুল আমিন
দিলরুবা ইয়াসমিন
শিউলি ইয়াসমিন
ফারাহ তাবাসসুম

গবেষণা সমন্বয়কারী

ড. নাথুরাম সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১, ফোন: ৭৭৯১৬৭০-২, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৭৭৯১৬৭৫
ই-মেইল: infoblri@gmail.com, web: www.blri.gov.bd

প্রকাশনা নং-২৯২, মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০ কপি

মুরগির গামবোরো রোগ নিয়ন্ত্রণ

ভূমিকা

ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ বা গামবোরো প্রধানত ৩-৬ সপ্তাহ বয়সের মুরগির বাচ্চার একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলোয়ারি স্টেটের গামবোরো নামক স্থানে ১৯৫৭ সালে প্রথম এই রোগটি সাবক্লিনিক্যাল অবস্থায় দেখা দেয়। পরবর্তীতে আশির দশকের প্রথমে আমেরিকা এবং ইউরোপের পোল্ট্রি খামারে এ রোগ মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। ১৯৯২ সালে রোগটিকে প্রথম বাংলাদেশে সনাক্ত করা হয় এবং তারপর হতে প্রতিবছর পোল্ট্রি খামারে এ রোগের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এ রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ২০-৯০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। গামবোরো রোগ দুই ভাবে খামারের ক্ষতি করে থাকে।

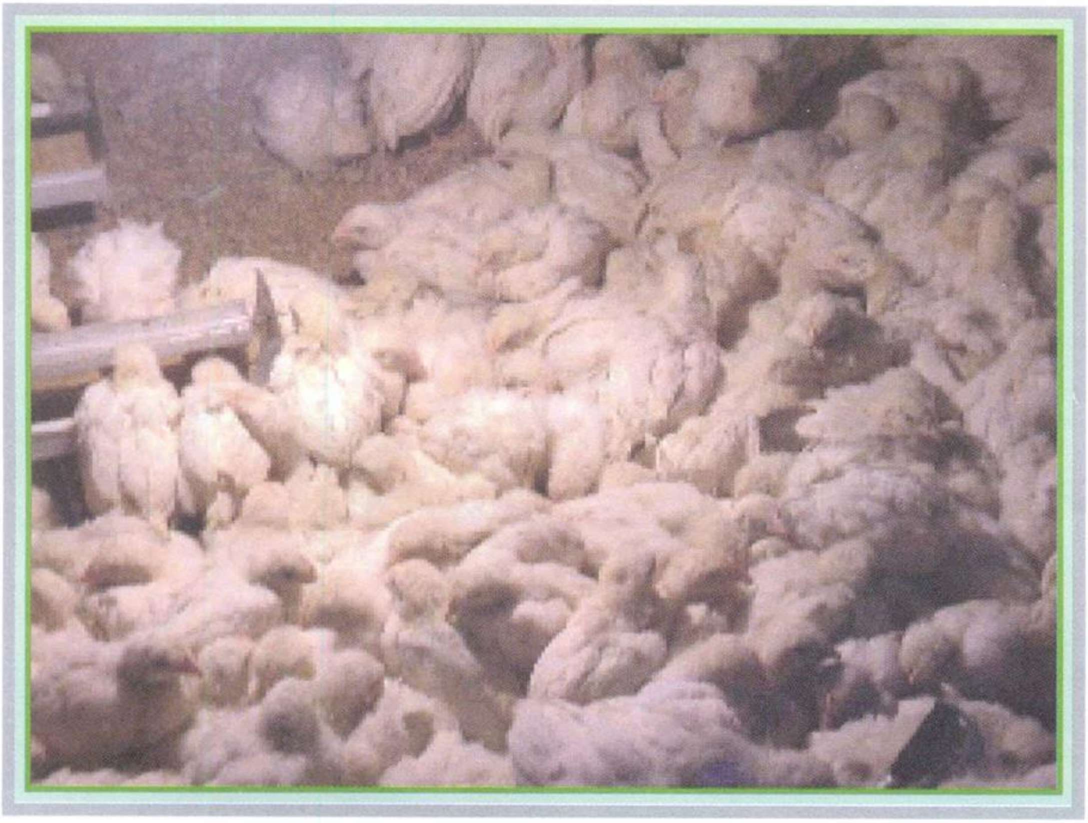

প্রথমত মুরগির ব্যাপক মৃত্যু ঘটিয়ে এবং দ্বিতীয়ত মারাত্মকভাবে মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উৎপন্নকারী অঙ্গসমূহ বিনষ্ট করে। ফলে আক্রান্ত মুরগি পরবর্তীতে রাণীক্ষেত, কক্সিডিওসিস, সালমোনে লোসিস ও কলিবেসিলোসিসসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়। বছরের যে কোনো সময় এ রোগ দেখা দিতে পারে, তবে আবহাওয়ার যে কোনো পরিবর্তনের ফলে যখন মুরগি পীড়নজনিত সমস্যায় ভোগে তখন এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। এ রোগ প্রতিকারের জন্য ফলপ্রসূ কোনো চিকিৎসা নাই, তবে জৈব নিরাপত্তা এবং সঠিক সময়ে গুণগত মানসম্পন্ন টিকা প্রয়োগ করে সহজেই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। খামারিগণ আমদানিকৃত বিভিন্ন ধরনের গামবোরো টিকা ব্যবহার করে আসছেন। তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় টিকা ব্যবহারের পরও কোন কোন ক্ষেত্রে এ রোগের প্রাদুর্ভাবে মুরগি মারা যাচ্ছে এবং খামারিগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। টিকা ব্যবহারের পরও খামারে কখনও কখনো গামবোরো রোগ দেখা দেয় এর কারণগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) টিকা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারজনিত সমস্যা

- সঠিক তাপমাত্রায় টিকা সংরক্ষণ করা না হলে,
- সঠিক মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা না হলে,
- মাতৃপক্ষীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা অবস্থায় টিকা প্রদান করা হলে,
- টিকার গুণগতমান ঠিক না থাকলে,
- টিকা প্রদানকারীর ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব থাকলে ।

(খ) মুরগির শারীরিক সমস্যা

- টিকার জীবাণুর সাথে মুরগির দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংবেদনশীল না হলে,
- বাচ্চা নিম্নমানের হলে,
- একই ব্যাচে বিভিন্ন মাত্রার মাতৃপক্ষীয় এন্টিবডি থাকলে,
- মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক বিশেষ করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা হলে তা মুরগির বেড়ে ওঠার পথে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়,

- খাদ্যে অতিরিক্ত আফলাটক্সিন এর উপস্থিতি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট করে।

গামবোরো রোগ বিস্তারের কারণ

(ক) ঘরে মুরগির ঘনত্ব বেশি হলে এবং বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকলে,

(খ) বন্য পাখি বা প্রাণী খামারে অবাধে আসা যাওয়া করলে। জীবিত টিকা প্রয়োগ করা হলে,

(গ) আদৌ টিকা প্রদান না করা, কার্যকারিতা হ্রাসপ্রাপ্ত টিকার ব্যবহার অথবা অনিয়মিত টিকা প্রদান করা হলে,

(ঘ) একই খামারে বিভিন্ন বয়সের মুরগি পালন করা হলে,

(ঙ) মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার, যা মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে,

(চ) খামারে রোগ তৈরির উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভাইরাসের উপস্থিতি থাকলে,

(ছ) খাদ্যে আফলাটক্সিনের উপস্থিতি, যা মুরগির রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে,

(জ) গামবোরো রোগে আক্রান্ত বা মৃত মুরগি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সৎকার করা না হলে।

গামবোরো রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

১. খামারে উচ্চমান সম্পন্ন জৈব নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। খামারে ব্যবহারের জন্য পৃথক কাপড় ও জুতার ব্যবস্থা করতে হবে যা জীবাণুমুক্তভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের পূর্বে কার্যকর জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পা ভালভাবে ধৌত করতে হবে। গামবোরো ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর জীবাণুনাশক, যেমন আয়োডিন যৌগ, কমপক্ষে ৯ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। গুণগত মান সম্পন্ন খাদ্য ও জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করতে হবে। খামারের ভিতর এবং বাহিরের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে এবং আয়োডিন যৌগ স্প্রে করতে হবে। ম্যানেজার, সুপারভাইজার, দর্শনার্থী, ক্রেতা, শ্রমিক, খাবার সরবরাহকারী যানবাহন ও আশেপাশের অন্যান্য লোকজনের খামারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সীমিত সংখ্যক লোকজনের প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। খামার থেকে অসুস্থ ও মৃত মুরগি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে সৎকার করতে হবে।

২. খামারে এক বয়সের মুরগি পালন করতে হবে। অল ইন অল আউট (all in all out) পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে এই রোগ খুব ভালভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এক খামার থেকে অপর খামার কমপক্ষে ৩০০ মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে হবে যাতে রোগজীবাণুর ক্রস ট্রান্সমিশন হতে না পারে।

৩. মুরগির স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হবে এবং সকল প্রকার পীড়ন থেকে মুক্ত রাখতে হবে। স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য পর্যাপ্ত ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন সি সরবরাহ করতে হবে।

৪. পর্যাপ্ত মাতৃপক্ষীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পাওয়ার জন্য প্যারেন্ট স্টক এর এন্টিবডি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় টিকা দিতে হবে।

৫. সুস্থ বাচ্চাই কেবল পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারে। এর জন্য সুস্থ প্যারেন্ট স্টক থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে।

৬. পোল্ট্রি সমৃদ্ধ এলাকা, যেখানে গামবোরো রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সে সকল এলাকার ডিমপাড়া মুরগির বাচ্চাকে জীবিত টিকার সাথে মৃত টিকা দেয়া যেতে পারে। এর ফলে যদি কোনো কারণে জীবিত টিকা কার্যকর না হয় তখন মৃতটিকা গামবোরো রোগ থেকে মুরগিকে রক্ষা করবে।

ডিমপাড়া মুরগির জন্য গামবোরো রোগের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি

টিকা	বয়স (দিন)			
	৭ দিন	১৪ দিন	৩৫ দিন	২৮ দিন
জীবিত	-	১ ড্রপচোখে/মুখে	১ ড্রপচোখে/মুখে	১ ড্রপ চোখে/মুখে
মৃত	অর্ধেক মাত্রা চামড়ার নিচে	-	-	-

ব্রয়লার মুরগির জন্য গামবোরো রোগের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি

টিকা	বয়স (দিন)
	১৪ দিন
জীবিত	১ ড্রপচোখে/মুখে

সাবধানতা

ব্রয়লারে কোনো মৃত টিকা প্রদান করা উচিত নয়, কারণ এই টিকা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির পূর্বেই মুরগি বিক্রির উপযোগী হয়ে যায় এবং টিকা প্রয়োগের স্থানে প্রদাহ হওয়ায় বাজারমূল্য কম হবে।

খামারে নতুন বাচ্চা ওঠানোর আগে মুরগির ঘর পরিষ্কার করার নিয়মাবলী

গামবোরো ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

লিটার/বিষ্ঠা বাইরে ফেলতে হবে

লিটার/বিষ্ঠাগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। বিষ্ঠা ব্যবহার করে জৈবসার (কমপোস্ট) তৈরি করা যেতে পারে।

অন্যান্য দ্রব্যাদি পরিষ্কার করতে হবে/সরিয়ে ফেলতে হবে

মুরগির খাঁচা, খাবারের পাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি পানির সাথে ডিটারজেন্ট মিশিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

পানি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে

ভালভাবে পরিষ্কার করার জন্য উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহ উত্তম ।

মেঝে ভিজা অবস্থায় প্রতি ১০০০ (এক হাজার) বর্গফুট জায়গার জন্য ১ কেজি ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে ৫/৬ ঘন্টা রাখার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে ।

মুরগির খাঁচা, খাবারের পাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল প্রভৃতি জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে ।

গামবোরো ভাইরাস মারার জন্য ০.২-০.৫% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট বা আয়োডিন দ্রবণ ব্যবহার করা উত্তম ।

জীবাণুনাশক প্রয়োগ করার পর এক রাত্র রেখে দিতে হবে (টিন, লোহা বা তামার তৈরি পাত্রসমূহ ছাড়া)

টিন, লোহা বা তামার তৈরি দ্রব্য সমূহ জীবাণুনাশক দেয়ার কয়েক ঘন্টা পর ধৌত করে ফেলতে হবে ।

এরপর পানি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে দ্রব্যসমূহ ভালভাবে শুকাতে হবে

আয়োডিন দ্রবণ ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় ।

পরিশেষে মুরগির ঘর ফিউমিগেশন করতে হবে (বার ঘন্টা)

প্রতি ১০০০ বর্গফুট জায়গার জন্য মিশ্রণটির অনুপাত হবে, ফরমালিন ১৫০০ মিলি, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ৫০০ গ্রামএবং পানি ৫০০ মিলি ।

ফিউমিগেশন শেষ হওয়ার কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পর মুরগির ঘর নতুন বাচ্চা ওঠানোর জন্য প্রস্তুত হয় ।

প্যাকেজের উদ্ভাবক ঃ ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ড. এম, জে, এফ, এ, তৈমুর ও ডা. মোঃ মাসুদুর রহমান

মুরগির রাণীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণ

ভূমিকা

রাণীক্ষেত বা Newcastle disease মুরগি তথা পাখি জাতের ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক রোগ। ১৯২৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভায় রোগটি প্রথম সনাক্ত করা হয়। বাংলাদেশে এ রোগ বহু আগেই সনাক্ত করা হয়েছে। যে কোন বয়সের মুরগিই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বাচ্চা মুরগিতে এ রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ৯০ ভাগের উপর। বয়স্ক মুরগিতে মৃত্যুর হার কিছুটা কম। এ দেশে মোট মৃত মুরগির শতকরা ৪০-৬০ ভাগ মৃত্যু হয় রাণীক্ষেত রোগে। দেশী চড়ে বেড়ানো এবং বাণিজ্যিক উভয় প্রকার মুরগিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। বছরের যেকোন ঋতুতেই এ রোগ দেখা দিতে পারে। তবে হঠাৎ বৃষ্টি বা আবহাওয়ার যে কোন পরিবর্তনে যখন মুরগি পীড়ন জনিত সমস্যায় ভোগে তখন এরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। অধিক মৃত্যু হারের জন্য খামারিরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় ফলে ক্ষুদ্র খামারিরা খামার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা পোল্ট্রি শিল্পের জন্য হুমকি স্বরূপ। তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে, দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত টিকা খামারিরা নিয়মিত ব্যবহার করেও খামারে কোন কোন ক্ষেত্রে রানীক্ষেত রোগ দেখা দিচ্ছে। টিকা ব্যবহারের পরও খামারে কখনও কখনও রানীক্ষেত রোগ দেখা দেয়ার কারণ নিম্নে দেয়া হল।

টিকা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারজনিত ত্রুটি

- সঠিক তাপমাত্রায় টিকা সংরক্ষণ করা না হলে,
- সঠিক মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা না হলে,
- টিকার গুণগত মান ঠিক না থাকলে,
- জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা না হলে,
- টিকা প্রদানকারীর ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব থাকলে।

মুরগির শারীরিক ত্রুটি

- টিকার জীবাণুর সাথে মুরগির দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংবেদনশীল না হলে (Immunocompetence),
- খামারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিধ্বংসী রোগের প্রাদুর্ভাব হলে যেমন- গামবোরো চিকেন এনিমিয়া, রিও ভাইরাস ইনফেকশন, ইত্যাদি। এরোগগুলো মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উৎপন্নকারী অঙ্গসমূহকে দুর্বল করে দেয়, ফলে মুরগি সহজেই রাণীক্ষেতসহ অন্যান্য রোগের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে যায়,
- খাদ্যে আফলাটক্সিন (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট করে) এর উপস্থিতি থাকলে,
- মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক বিশেষ করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা হলে তা মুরগির বেড়ে ওঠার পথে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

রোগ বিস্তারের কারণসমূহ

(ক) শেডে মুরগির ঘনত্ব বেশি হলে,

খ) ঘর বা আশেপাশের পরিবেশ অপরিষ্কার থাকলে

(গ) বিভিন্ন বয়সের মুরগি একসাথে পালন করা হলে,

(ঘ) খামারে অবাধে বন্য পাখি প্রবেশ করলে,

(ঙ) অপরিকল্পিতভাবে টিকা প্রদান করলে,

(চ) অল ইন অল আউট (all in all out) পদ্ধতি অনুসরণ করা না হলে,

(ছ) সচেতনতার অভাবে মুরগির দেহে এন্টিবডির পরিমাণ নির্ণয় না করে টিকা ব্যবহার করলে,

(জ) মৃত মুরগি খোলা অবস্থায় যেখানে সেখানে ফেলে রাখলে।

রাণীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

১. খামারে উচ্চমান সম্পন্ন জৈব নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। খামারে ব্যবহারের জন্য পৃথক কাপড় ও জুতার ব্যবস্থা থাকতে হবে যা জীবাণুমুক্তভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের পূর্বে কার্যকর জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পা ভালভাবে ধৌত করতে হবে। গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ও জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করতে হবে। খামারের ভিতর এবং বাহিরের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে। ম্যানেজার, সুপারভাইজার, দর্শনার্থী, ক্রেতা, শ্রমিক, খাবার সরবরাহকারী যানবাহন ও আশেপাশের অন্যান্য লোকজনের খামারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সীমিত সংখ্যক লোকজনের প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। খামার থেকে অসুস্থ ও মৃত মুরগি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা সৎকার করতে হবে।

২. সকল সময় অল ইন অল আউট (all in all out) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ খামারে একই বয়সের মুরগি একবারে প্রবেশ করাতে হবে এবং নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পালন করার পর এক সাথে বের করে ফেলতে হবে। একটি খামার হতে অপর খামার কমপক্ষে ৩০০ মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে হবে যাতে রোগজীবাণুর ক্রস ট্রান্সমিশন হতে না পারে।

৩. মুরগির দেহে রাণীক্ষেত রোগের এন্টিবডি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় টিকা দিতে হবে।

৪. টিকা প্রদানের পর (জীবিত টিকার ক্ষেত্রে ১৫ দিন এবং মৃত টিকার ক্ষেত্রে ৩০ দিন পর) নিয়মিত হিমাগ্লুটিনেশন ইনহিবিশন বা এইচ.আই (Haemagglutination Inhibition) পরীক্ষা করে মুরগিতে উৎপাদিত এন্টিবডির পরিমাণ নির্ণয় করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

৫. রাণীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বন্য এবং গৃহপালিত প্রাণীর খামারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মূল খামারের চারদিকে কমপক্ষে ৫ ফুট দূরত্বে ৫ ফুট উচুঁ বেড়া দিতে হবে। বন্যপাখি প্রতিরোধের জন্য সঠিকভাবে ঘর তৈরি করতে হবে এবং প্রয়োজনে অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে পরিত্যক্ত পানির বোতলে এলুমিনিয়াম ফয়েল জড়িয়ে বন্যপাখি প্রতিরোধক তৈরি করে খামারের চারিদিকে ৩ মিটার পর পর ঝুলিয়ে দিতে হবে। রাণীক্ষেত রোগের প্রতি বিভিন্ন মাত্রায় সংবেদনশীল মুরগি এবং অন্যান্য বন্য ও পোষা পাখির একটি তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হলো-

অতি সংবেদনশীল	অল্প সংবেদনশীল	খুব কম সংবেদনশীল
		মুরগি জাতীয় পাখি
পেঙ্গুইন	পানিতে বসবাসকারী পাখি যেমন হাঁস	
কবুতর	প্যাঁচা	কোয়েল
	টিয়া পাখি	ঈগল
গাংচিল		উট পাখি
বক	সারস	
	চড়ুই	রেলিফরমিস
		অন্যান্য গানের পাখি

৬. আক্রান্ত বা মৃত মুরগি, নাড়িভূঁড়ি ও মল পুড়িয়ে ফেলা উত্তম। তবে গভীর গর্ত করে এগুলো পুঁতে চুন বা ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখা যেতে পারে। বন্য প্রাণী যাতে এগুলো উপরে তুলে আনতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৭. মুরগির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে এবং যে কোন ধরনের পীড়ন থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে।

৮. রাণীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি অনুযায়ী টিকা প্রদান করতে হবে। প্যারেন্ট স্টকে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং মাতৃ পক্ষীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য বাংলাদেশের সকল হ্যাচারিতেই নিয়মিত এ রোগের টিকা প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ফলে দেখা যায় সকল বাচ্চাই কিছু না কিছু মাতৃ পক্ষীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসহ জন্ম গ্রহণ করে যা কমপক্ষে ১৪ (চৌদ্দ) দিন পর্যন্ত এ রোগের জীবাণুকে প্রতিরোধ করতে পারে। জীবিত টিকাসমূহ সংরক্ষণ ও প্রয়োগের সময় খুবই সতর্ক থাকতে হয়। জীবিত টিকা চোখ, মুখ বা নাক দিয়ে প্রয়োগ করা যায়। তবে চোখ এবং নাক দিয়ে টিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে টিকা শোষণ হওয়ার পর বাচ্চাকে ছাড়তে হবে। অন্যথায় চোখ বা নাক থেকে টিকা পড়ে যাবে এবং টিকা প্রদান অকার্যকর হতে পারে। জীবিত টিকা সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকলে মৃত টিকা (Killed vaccine) ব্যবহার করা যেতে পারে। জীবিত টিকা প্রয়োগের ১৫ দিন পর এবং মৃত টিকা প্রয়োগের ৩০ দিন পর ব্যবহৃত টিকার কার্যকারিতা বা উৎপাদিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিমাণ জেনে নিতে হবে।

পরের পৃষ্ঠায় রাণীক্ষেত রোগের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি দেয়া হলো-

ডিমপাড়া মুরগির জন্য রাণীক্ষেত রোগের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি

টিকা	বয়স (দিন)			
	৭-১০ দিন	২১ দিন	৩১-৩৫ দিন	১২০ দিন
জীবিত	১ ড্রপচোখে/মুখে	১ ড্রপ চোখে/মুখে	-	-
মৃত	-	-	অর্ধেক মাত্রা চামড়ার নিচে	পুরা মাত্রা চামড়ার নিচে

অথবা

টিকা	বয়স (দিন)			
	৭-১০ দিন	২১ দিন	৩৫ দিন	৬০ দিন
বিসিআরডিভি	১ ড্রপচোখে/মুখে	১ ড্রপচোখে/মুখে	১ ড্রপচোখে/মুখে	-
আরডিভি	-	-	-	১ ডোজ চামড়ার নিচে

পরবর্তীতে প্রতি দুইমাস অন্তর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনে টিকা দিতে হবে ।
ব্রয়লার মুরগির জন্য রাণীক্ষেত রোগের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি

টিকা	বয়স (দিন)	
	৭-১০ দিন	২১ দিন
জীবিত	১ ড্রপ চোখে/মুখে	১ ড্রপ চোখে/মুখে

গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি জীবিত টিকা প্রদানের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পর অন্য একটি জীবিত টিকা প্রদান করা হলে ব্যবহৃত টিকাসমূহের ভাল কার্যকারিতা পাওয়া যায় ।

সাবধানতা

ব্রয়লার মুরগিতে মৃত টিকা প্রদান করা উচিত নয়, কারণ এ টিকা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির পূর্বেই মুরগি বিক্রির উপযোগী হয়ে যায় এবং টিকা প্রয়োগের স্থানে প্রদাহ থাকায় মুরগির বাজারমূল্য কমে যায় ।

প্যাকেজের উদ্ভাবক ঃ ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ড. এম,জে,এফ,এ, তৈমুর ও ডা. মোঃ মাসুদুর রহমান

সেশন ১১ঃ প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী ও খামার উন্নয়নে বিশেষ করে উন্নত জাতের পশুখাদ্য উৎপাদনে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান এবং উপকরণ সরবরাহ করে থাকে। হাঁস-মুরগী পালনে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের উপর সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের আয়োজন ও তথ্য প্রদান করে। প্রধান কার্যালয় খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকাতে অবস্থিত। দেশের প্রতি উপজেলা, জেলা ও বিভাগে এই অধিদপ্তরের কার্যালয় আছে। উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় হাসপাতালে গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান করা হয়। উপজেলা, জেলা ও ইউনিয়ন কল্যান কেন্দ্র ও এ আই পয়েন্টে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলোতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া পশু খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য বিভিন্ন জাতের ঘাসের চারা ও কাটিং সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। স্থানীয় পর্যায়ে ডিএলএস এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলোর তালিকা নিচে দেয়া হলো।

১. গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান
২. গবাদিপশুর কৃত্রিমপ্রজনন
৩. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর টিকাদান
৪. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর পালনে উন্নত প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ
৫. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী উৎপাদনে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ
৬. উন্নত জাতের ঘাসের চারা/বীজ বিতরণ
৭. পশুখাদ্য তৈরী/বিক্রয় লাইসেন্স প্রদান
৮. দুধ ও ডিম উৎপাদন ও বিক্রয়
৯. নমুনা গ্রহণ, পরীক্ষাকরণ ও রোগ নির্ণয়
১০. পশুপাখীর খাদ্য ও খাদ্য উপকরণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং খাদ্য তালিকা প্রণয়ন
১১. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খামার ব্যবস্থাপনা
১২. পুনর্বাসন ও উপকরণ সহায়তা প্রদান ও দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরী সেবা প্রদান
১৩. প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য বিক্রয়
১৪. ক্ষতিপুরণ প্রদান

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী প্রাণিজাত পণ্য যেমন ডিম, দুধ, মাংশ প্রক্রিয়াজাত পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি নির্ধারণও গরুত্বপূর্ণ। একইভাবে হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল ও ভেড়া সহ প্রাণি এবং প্রাণিজাত পণ্য বজারজাত পরিকল্পনাও করতে হবে।

প্রক্রিয়াজাত

প্রাণিজাত পণ্য	প্রক্রিয়াজাত পদ্ধতি
ডিম	
দুধ	
মাংশ	
অন্যান্য	

বাজারজাত পরিকল্পনা

প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য	পরিমাণ	বিক্রয় তারিখ	বাজারের নাম	বাজার দর	পরিবহন ব্যবস্থা	যোগাযোগ (ঠিকনা/মোবাইল নং)
হাঁস						
মুরগী						
বাছুর						
গরু						
গাভী						
ছাগল						
ভেড়া						
ডিম						
দুধ						
মাংশ						
অন্যান্য						

প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের সেবা

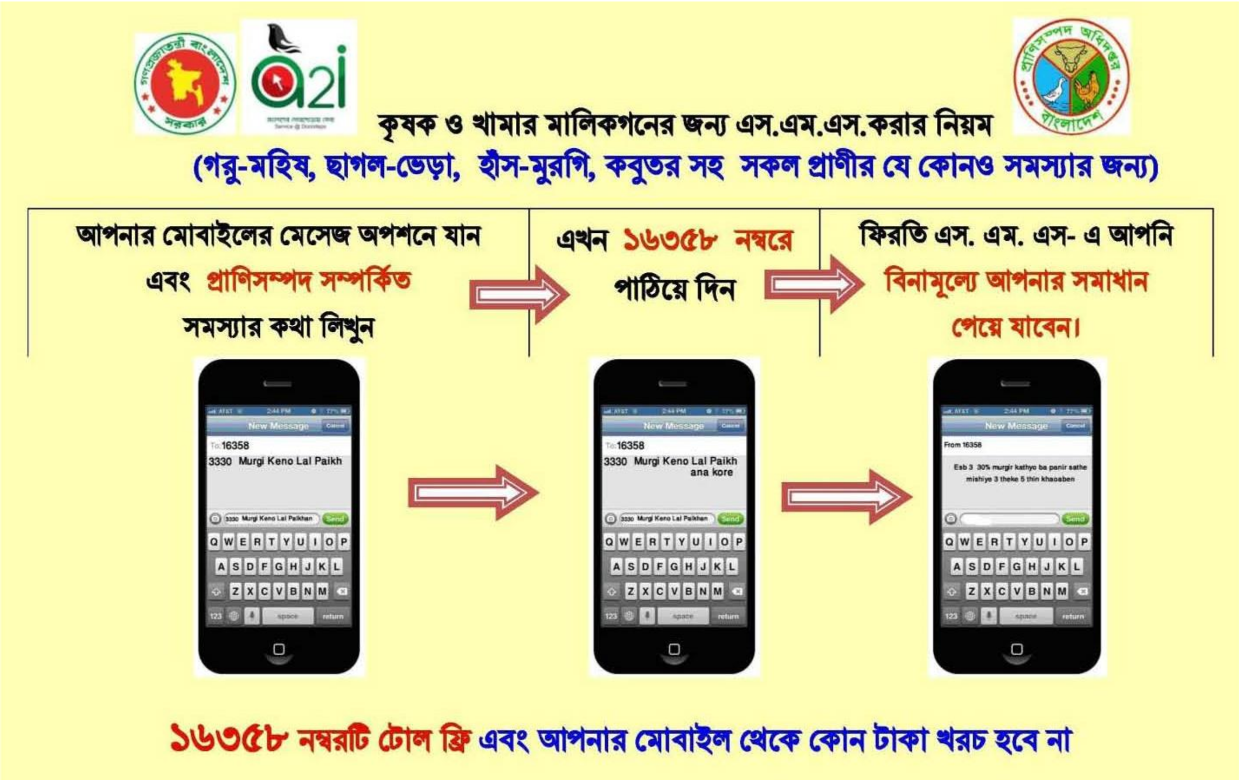

সার আলোচনা ও প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তি